দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের
শ্রেষ্ঠ কবিতা

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

শ্রেষ্ঠ কবিতা

শোভন সোম

-সম্পাদিত

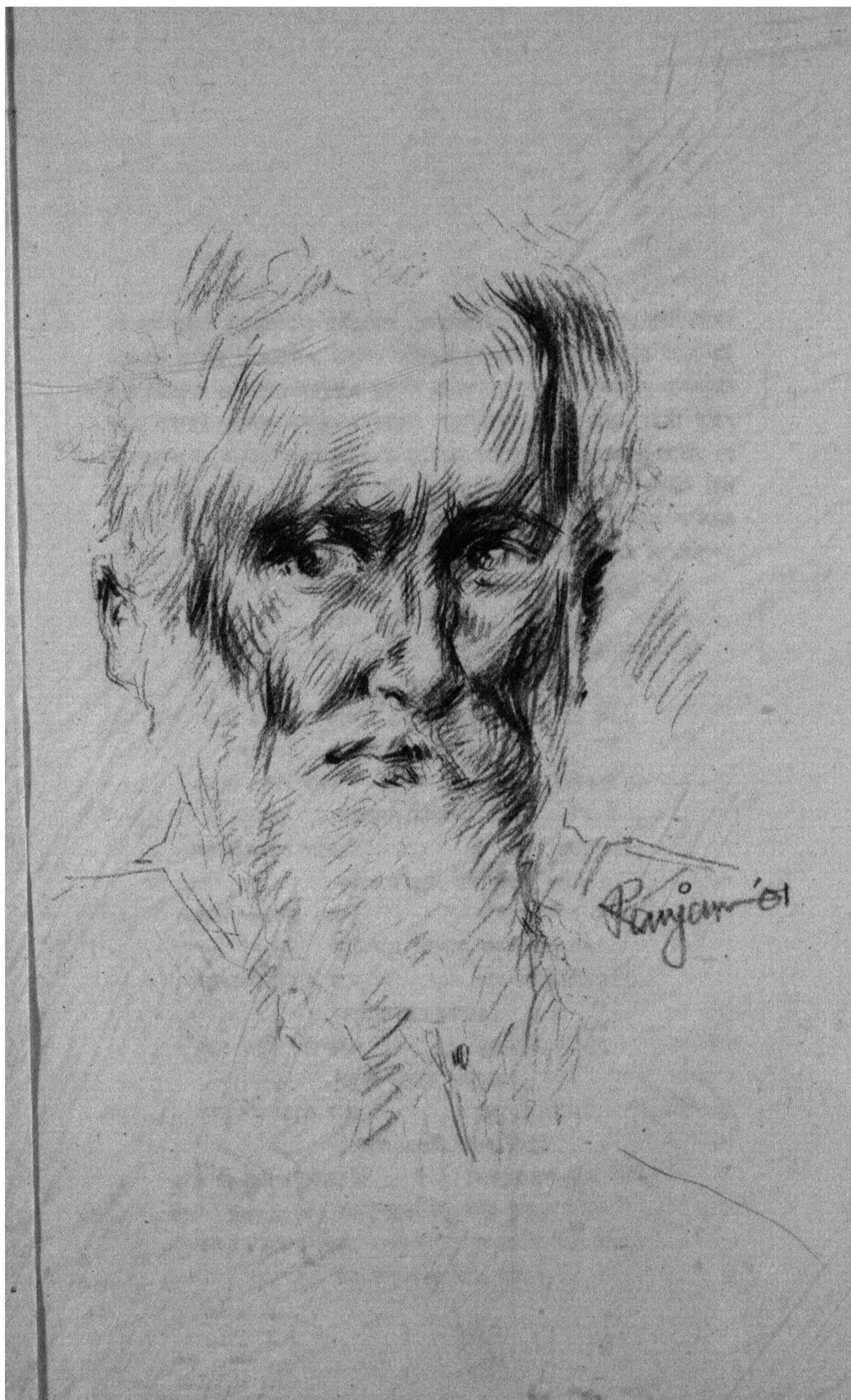
ভারবি

১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪০৮, জানুয়ারি ২০০২

প্রচ্ছদ ও রেখাঙ্কন : রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষরবিন্যাস ভারবি। মুদ্রক · শ্যামলী ঘোষ।
কল্যাণী প্রিন্টার্স। ১৭ কানাই ধর লেন। কলকাতা-১২


Ranjan '01

যে পরম্পরার উত্তরাধিকার রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন, সেই পরম্পরার রচয়িতাদের অন্যতম ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে একুশ বছরের বড়ো এই দাদা রবীন্দ্রনাথের জন্মের এক বছর আগেই কালিদাসের 'শকুন্তলা'র অনবদ্য কাব্যানুবাদ করে বাংলার সারস্বতসমাজকে মোহিত করেছিলেন। কুড়ি বছর বয়সী তরুণ দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুবাদ পড়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বলেছিলেন, বাংলা ভাষায় যে এমন কবিতা রচিত হতে পারে, সেই ধারণাই তাঁর ছিল না। এই অনুবাদ ছিল সাবলীল, অথচ, এর বাংলা ছিল অত্যন্ত সরস ও স্বাদু। তাৎকালিক কবিতার তৌলে এমন সহজ স্বাভাবিকতা ছিল রীতিমতো অভাবিত। দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

'কুবের আলয় ছাড়ি উত্তরে আমার বাড়ি,
গিয়া তুমি দেখিবে সেথায়—
সম্মুখে বাহির দ্বার, বাহার কে দেখে তার,
ইন্দ্রধনু যেন শোভা পায়।
পার্শ্বে এক সরোবরে জলে থই থই করে,
পদ্ম সনে আলি করে ঠাট।
উহার একটি ধারে, অপরূপ দেখিবারে।
পরকাশে মণিবাঁধা ঘাট।...
মাধবী মণ্ডপ পরে, কুরুবক শোভা করে
ফুলগন্ধে ছুটে অলিকুল।
লতায় পাতায় ঘেরা, আছয়ে সবার সেরা,
দুটি গাছ অশোক বকুল
অশোক ভাবিছে মনে, পাব আমি কতক্ষণে,
বধূটির চরণ-আঘাত।
কবে আমি পাব মিঠা, মুখ-মদিরার ছিটা,
বকুল ভাবয়ে দিনরাত।
তাহার মাঝেতে আর, ময়ূরের বসিবার,
সোনার একটি আছে দাঁড়।
শিখী যথা কেকাভাষী, সন্ধ্যাকালে বসে আসি,
আনন্দেতে উচাঁ করি ঘাড়।।
তাহারে নাচায় প্রিয়া, করতালি দিয়া দিয়া,
রন্ রন্ বাজে তায় বালা।

স্মরিতে সে সব কথা মরমে জনমে ব্যথা
জ্বলি উঠে হৃদয়ের জ্বালা।।'

কাব্য, চিত্রকলা, সংগীত, স্বরলিপি-রচনা, তত্ত্বজ্ঞান, ধর্ম-প্রসঙ্গ, বক্সোমেট্রি, ত্রিকোণমিতি -ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে তাঁর আগ্রহ থাকলেও কাব্যের জন্য তিনি তুলনামূলকভাবে বেশি সময় দিতে পারেননি। বাংলা 'নীতিকথা' শেষ করেই তিনি প্রবেশ করেছিলেন সংস্কৃত 'মুগ্ধবোধ', 'রঘুবংশ' ও 'কুমারসম্ভব'-এ রামনারায়ণ তর্করত্নের তত্ত্বাবধানে। অপরিণত বয়সের পক্ষে কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' পাঠ আদৌ সংগত ছিল কিনা তা অবশ্যই ভেবে দেখবার বিষয়; যেহেতু 'নীতিকথা'র তত্ত্বোপদেশের পরেই 'শকুন্তলা', 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব' সরাসরি 'মুগ্ধবোধ'-এর সঙ্গে বালকের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার থেকেই অনুমান করে নেওয়া যায় যে, উনিশ শতকের মধ্যভাগেও শিশু ও বালকের পাঠোপযোগী বইপত্র ছিল না। দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছেন যে, 'তখন ছোটো ছোটো ছেলেদের পড়িবার উপযোগী বাংলা বই বড়ো বেশি ছিল না।' কিন্তু যে-সংস্কৃত বই বালকদের পড়ানো হত, তা-ও কি বালক-পাঠ্য ছিল? উনিশ শতকের হাড়হদ্দ বুঝতে হলে এই ব্যাপারটাও বুঝতে হবে, কারণ কালিদাস বা সংস্কৃত কবিরা কেউ রেখে-ঢেকে লেখেননি।

আঠারোশো ষাটে 'মেঘদূত' প্রকাশের পর তেরো বছর তিনি তত্ত্বচর্চায় নিমগ্ন হলেন। এরপরে তিনি লিখলেন 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' নামে একটি রূপককাব্য যা বস্তুত ছিল কাব্যের আশ্রয়ে তাঁর তত্ত্বচর্চারই একটি বিশেষ শাখাবিস্তার। 'স্বপ্ন-প্রয়াণ'-এর অংশবিশেষ এই সংকলনে গ্রন্থিত হল। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণে 'স্বপ্ন-প্রয়াণ'-এর কথা রয়েছে। অগ্রজ, পিতৃপ্রতিম এই দাদার 'স্বপ্ন-প্রয়াণ'কে রবীন্দ্রনাথ 'রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ' বলেছিলেন। 'তাহার কতরকমের কক্ষ-গবাক্ষ চিত্রমূর্তি ও কারুনৈপুণ্য। তাহার মহলগুলিও বিচিত্র।' 'স্বপ্ন-প্রয়াণ'-এর পরিত্যক্ত পাতা বাড়িময় ছড়াছড়ি উড়ে বেড়াত। রবীন্দ্রনাথের কথায় তাঁর বড়োদাদার 'কবিকল্পকার এত প্রচুর প্রাণশক্তি ছিল যে', তার যতটুকু আবশ্যক, তার চেয়ে বেশি দ্বিজেন্দ্রনাথ ফলাতেন। এ কারণে বিস্তর লেখা ফেলে দিতে তাঁর বাধত না। 'স্বপ্ন-প্রয়াণ'-এ স্বপ্নের বিভিন্ন মহলের বিচরণ নিয়ে বিস্তর তারিফি লেখা আরও অনেকে লিখেছেন, কিন্তু 'স্বপ্ন-প্রয়াণ'কে কালের পটে রেখে দেখা হয়নি। 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' বই আকারে প্রকাশিত হয় আঠারোশো পঁচাত্তরে, প্রথম সর্গ 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত হয় তার দু-বছর আগে। দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র কতক ছেপেছিলেন, কতক ছাপেননি, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ'-এ 'স্বপ্ন-প্রয়াণ'-এর প্রভাব আছে। সাহিত্যে পারস্পরিক প্রভাব পড়তে পারে। কিন্তু তারও চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, সিগমুন্ড ফ্রয়েড উনিশশো দুই'তে স্বপ্নতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে তাঁর থিসিস প্রকাশ করেন। ওই বছরই প্রথম সায়ান্স ফিকশন ফিল্ম 'আ ট্রিপ টু মুন' তৈরি হয়। উনিশশো পাঁচে আইনস্টাইন আপেক্ষিকতত্ত্ব প্রচার করেন এবং ওই বছরই প্রথম সংবাদপত্রে অকুস্থলের আলোকচিত্র ছাপা হয়—হাজার মাইল দূরের ঘটনা হুবহু চাক্ষুষ হয়। উনিশশো ছয়ে প্রথম

দূরভাষ চালু হয়। সম্ভবত, 'স্বপ্ন-প্রয়াণ'-এর গুরুত্ব এইখানেই যে, সিগমুণ্ড ফ্রয়েড স্বপ্নোত্থিত অবচেতন বা সাব্‌কনশাস তত্ত্ব প্রচারের আগেই দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর এই রূপককাব্যে অবচেতন-তত্ত্বেরই অবতারণা করেছিলেন।

'সুপ্তিতে ডুবিয়া গেল জাগরণ
সাগর-সীমায় যথা অস্ত যায় জ্বলন্ত-তপন ...
মনোরাজ্য নামটি মধুতে ভরা
ফুটে যথা পারিজাত, বিচরে গন্ধর্ব-অপসরা।'

উনিশশো দুই থেকে যে যুগান্তকারী তত্ত্বচর্চা ও আবিষ্কার বিশ শতকের আধুনিকতার যাত্রা ত্বরান্বিত করেছিল, তার আলোচনা বিস্তর হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ উলটো জামা পরতেন, জল দিয়ে লুচি ভাজতে উপদেশ দিতেন, কাকপক্ষী কাঠবেড়ালি তাঁর গায়ে অক্লেশে এসে বসতো, শালিক পাখি তাঁর চোখের পিচুটি সাফ করতে গিয়ে ঠুকরে দিয়েছিল, স্বভাবে তিনি ছিলেন আলাভোলা, বিষয় সম্পর্কে উদাসীন এবং তাঁর চিরকুট কবিতা নিয়ে এলাহি মাপে লেখালেখি হলেও নেহাত ডিগ্রির জন্যে পড়তে হবে বলেই, দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিতার কিঞ্চিৎ বাধ্যতামূলক পঠন-পাঠন হয়; তার বেশি নয়। 'স্বপ্ন-প্রয়াণ'-এ স্বপ্নতত্ত্বের যে চর্চা অতদিন আগে তিনি কাব্যছলে করেছিলেন, তার দিকে আমরা খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে এখনও দেখিনি।

'স্বপ্ন-প্রয়াণ'কে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই রূপক বলেছিলেন। এই কাব্যে একাধিক রূপক আছে। ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী লিখেছিলেন যে, তাঁর জ্যাঠামশাই দ্বিজেন্দ্রনাথ 'স্বপ্ন-প্রয়াণে'র ভণিতায় এইভাবে বংশ-পরিচয় দিয়েছিলেন রূপকার্থে—

'ভাতে যথা সত্য-হেম, মাতে যথা বীর;
গুণ-জ্যোতি হরে যথা মনের তিমির।
নবশোভা ধরে যথা সোম আর রবি,
সেই দেব-নিকেতন আলো করে কবি।'

এরমধ্যে ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও খুড়তুতো ভাই গুণেন্দ্রনাথের নাম ছাড়াও দেবেন্দ্রনাথের আবাসকে দেব-নিকেতন বলা হয়েছে। এই অর্থোদ্ধার থেকে তাঁর কবিতা আমাদের কাছে আরও সরস হয়ে ওঠে। নিজের পরিচয় এখানে তিনি কবি হিসেবে দিয়েছিলেন।

কালিদাসের অনুবাদ, 'স্বপ্ন-প্রয়াণ', ব্রহ্মসংগীত রচনা ছাড়াও তাঁর 'কাব্যমালা'য় সংকলিত হয়েছে তাঁর বিকীর্ণ কবিতাবলি।

আভিজাত্যের আবশ্যিক-চর্চা হিসেবে তিনি সংগীতের চর্চা করেছিলেন। কিন্তু সে চর্চা কেবল রসাস্বাদনের উদ্দেশ্যে তিনি করেননি। এই ক্ষেত্রেও তাঁকে আমরা পথিকৃৎ হিসেবে পাই। আঠারোশো উনসত্তরে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় যে বাংলা স্বরলিপির রীতি উদ্ভাবন করেছিলেন, পাঁচটি ব্রহ্মসংগীত সেই স্বরলিপিতে নিবদ্ধ করেছিলেন এবং স্বরলিপি পড়বার বিধি ব্যাখ্যা করেছিলেন, সেইটিই ছিল প্রথম বাংলা গানের স্বরলিপির উদ্ভাবন এবং স্বরলিপির সাধারণীকরণ। তার আগে বাংলায় সর্বজনবোধ্য ও গ্রাহ্য স্বরলিপি রীতি ছিল না। তবে তাঁর দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপির

পরিবর্তে বাংলায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত আকারমাত্রিক স্বরলিপিই রবীন্দ্রনাথের সুবাদে প্রচলিত ও একমাত্র স্বরলিপি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সৈয়দ মুজতবা আলী আক্ষেপ করেছিলেন যে, এই তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিত সম্পর্কে বাংলায় অতীব সামান্য আলোচনা হয়েছে। সুকুমার সেন তাঁর সাহিত্যের ইতিহাসে দ্বিজেন্দ্রনাথকে উপেক্ষা করেননি বলে, মুজতবা আলী তাঁর কাছে বঙ্গজনের হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। সব্যসাচী এই মানুষটির আগ্রহের ও সৃষ্টির বিস্তার ছিল বিচিত্রমুখী। স্বরলিপি লিখন-পদ্ধতি উদ্ভাবনের সঙ্গে তিনি গীত রচনায় ও সুর সংযোজনেও তাঁর অশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, যদিও তাঁর গানগুলির সুরাবয়ব উনিশ শতকের ধারায় শাস্ত্রীয় রাগের শুদ্ধতাকেই শ্রেয় বলে গ্রহণ করেছিল। তাঁর সুর-সংযোজনের বৈশিষ্ট্য এই যে, কাব্যের ভাবের অনুকূল সুরই আমরা তাঁর সংগীত রচনায় পাই। যেমন, তীব্রস্বর পরজের আকুতি 'আজি কি হরষ সমীর বহে প্রাণে'-র কথার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। ঝিঁঝিট ঠুংরিতে যে 'কর তাঁর নাম গান'-এর মতো বৈতালিকের গান রচনা করা যায়, তার অনুপম নিদর্শন হয়ে আছে এই গান। 'জাগ সকল অমৃতের অধিকারী' গানের সুর ভৈরবী ঠাটের আশাবরীতে আশ্চর্যভাবে মানিয়ে যায়; মনে হয় যেন এই আশাবরী এই গেয় বাকের অপেক্ষায় ছিল। রাজা রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত ব্রহ্মসংগীতের বিবর্তনের পর্যায়গুলি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, এই সংগীতের ভাবগম্ভীর্য তিনি অতি সহজ বাক্যবন্ধে প্রকাশ করেছিলেন এবং রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীতের সেতুবন্ধ তিনিই রচনা করেছিলেন। ব্রহ্মসংগীতের কথা ও সুরের ক্রমবিকাশে এক একজন গীতিকারের ভূমিকা নিয়ে গবেষণার বিস্তর অবকাশ থাকলেও, এখন এ বিষয়ে আগ্রহ দেখা যায়নি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরের উপাসনায় এখনও তাঁর গান শোনা যায়। শান্তিনিকেতনে 'কর তাঁর নাম গান' বছরে একদিন আনুষ্ঠানিকভাবে শোনা যায়। কিন্তু বাঙালির সংগীতচর্চায় তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এ দুর্ভাগ্য তাঁর নয়, এ দুর্ভাগ্য বাঙালির। মুজতবা আলী লিখেছেন যে, 'তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে' দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনা এবং 'রেখাক্ষর-বর্ণমালা'তে তিনি এটি ব্যবহার করেছেন। বস্তুতপক্ষে, 'তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে' তাঁর অনুজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা।

তত্ত্বচর্চার জন্যে কবিতার ব্যবহার বা কবিতার ভাষায় তত্ত্বচর্চার দিন ফুরিয়ে গিয়েছে। ভারতের কবিরা যে কাব্যের ভাষায় দর্শনের গভীর দুরূহ তত্ত্ব প্রকাশ করে গিয়েছেন, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ হিবার্ট-বক্তৃতায় বলেছিলেন। কিন্তু আধুনিককালে শর্টহ্যান্ডের মতো একটি বিষয়ের প্রস্তাব ও নতুন রীতির ব্যবহার-পদ্ধতি যে কবিতার ভাষায় দেওয়া যায়, এই ভাবনাটিই অভিনব। শর্টহ্যান্ডের মতো একটি বিষয় কেন তাঁকে আগ্রহী করল, কেন তিনি বাংলায় শর্টহ্যান্ডের সংকেত তৈরি করলেন, কেন দু-দুবার সম্পূর্ণ হাতে লিখে লিথোতে তাঁকে সেই ব্যয়বহুল বই 'রেখাক্ষর-বর্ণমালা' নিজের খরচে ছাপতে হল, এই প্রশ্নের একটিই সম্ভাব্য উত্তর আছে বলে বোধ করি। উত্তরটি এই যে, এই প্রস্তাবনার মাধ্যমে তিনি বাংলা বর্ণমালার সংস্কার সাধন

করতে চেয়েছিলেন। বহু বর্ণের অসারত্ব তিনি কবিতার সহজ ভাষায় দর্শিয়ে বাংলা বর্ণমালার যে আঁটোসাঁটো ছিমছাম রূপটি দিতে চেয়েছিলেন, তা ছিল অভিনব; প্রায় নব্বই বছর আগে তাঁর এমন ভাবনা ছিল বৈপ্লবিক। তখনও কেউ বাংলা বর্ণমালার সংস্কার নিয়ে ভাবেননি। তিনি লিখেছিলেন

'বত্রিশ সিংহাসন

বাংলা বর্ণমালায় উপসর্গ নানা।
অদ্‌ভূত নূতন যত কাণ্ডকারখানা।।
য-য়ে শূন্য, ড-য়ে শূন্য, শূন্য পালে পাল।
দেবনাগরিতে নাই এসব জঞ্জাল।।
য যবে জমকি বসে শবদের মুড়া।
জ বলে সবাই তারে—কি ছেলে কি বুড়া।।
মাথায় কিংবা ল্যাজায় নিবসে যখন।
ইয় উচ্চারণ তার কে করে বারণ।।
ময়ূর ময়ূর বই মজুর তো নয়।
উদয উদজ নহে উদয় উদয়।।'

এভাবে তিনি ড়, ঢ়, র-এর অসারত্ব বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ শর্টহ্যান্ডের সংকেতগুলি প্রস্তাব করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একই পন্থায় বর্ণমালা সংস্কারের প্রস্তাবও করেছিলেন। যে বিষয় একেবারে গদ্য প্রকাশের বিষয়, তেমন বিষয়কে তিনি কবিতার অলংকার দিয়ে পেশ করেছিলেন।

'আষাঢ়ে ঢাকিল নভ পযোধর-জালে।
বাযস উড়িয়া বসে ডালের আড়ালে।।
ঘনরবে ময়ূরের আনন্দ না ধরে।
খুলিযা খড়ম জোড়া ঢুকিলাম ঘরে।।

পংক্তি প্রসঙ্গে মুজতবা আলী লিখেছেন, 'একেই বোধহয় গ্রীক অলংকারের ইংরাজিতে 'বেথস্' বলা হয়। প্রথম তিন লাইনে নৈসর্গিক বর্ণনার মায়াজাল নির্মাণ করে হঠাৎ খড়ম-জোড়ার মুদ্‌গর দিয়ে আলঙ্কারিক মোহমুদ্‌গর নির্মাণ।' এরই মধ্যে পয়ার ভেঙে এগারো মাত্রায় তিনি লিখলেন,

'চারি বর্গপতি

ক চ-বরগের ক মহারথী;
ত প-বরগের ত কুলপতি,
ন ট-বরগের ন নটবর;
র স-বরগের র গুণধর;—
চারি বরগের চারি অধীপ
বরণমালার কুলপ্রদীপ।'

এই, এউ, আই -ইত্যাদি ডিপথং-এর অনুশীলনে তিনি লিখেছিলেন,

'আউলে গোঁসাই গউর চাঁদ
ভাসাইল দেশ টুটিয়া বাঁধ

দুই ভাই মিলে আসিছে অই
কি মাধুরী আহা কেমনে কই।। ...'

ইত্যাদি নিছক শর্টহ্যান্ড শেখানোর উদ্দেশ্যেই তিনি লেখেননি। এই 'রেখাক্ষর বর্ণমালা'তেই তিনি লিখলেন,

'আনন্দের বৃন্দাবন আজি অন্ধকার।
গুঞ্জরে না ভৃঙ্গকুল কুঞ্জবনে আর।।
কদম্বের তলে যায় বংশী গড়াগড়ি।
উপুড় হইয়া ডিঙা পঙ্কে আছে পড়ি।।
কালিন্দীর কূলে বসে কান্দে গোপনারী।
তরঙ্গিণী তরাইবে কে আর কাণ্ডারী।।
আর কি সে মন চোর দেখা দিবে চক্ষে।
সিন্ধিকাঠি থুয়ে গেছে বিন্ধাইয়া বক্ষে।।'

ন ঙ ম-প্রধান যুক্তাক্ষর কী সহজভাবে তিনি এই অংশে দেখালেন, তা ভাবতে বিস্ময় জাগে।

রামনারায়ণ তর্করত্নের ছাত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ সংস্কৃতের সাগর মন্থন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই লিখেছিলেন যে, যাবতীয় সংস্কৃত ছন্দ ছিল তাঁর করতলগত আমলকীবৎ। একদা কেউ বলেছিলেন, বাংলায় মন্দাক্রান্তা ছন্দে কাব্য-রচনা সম্ভব নয়। সঙ্গে-সঙ্গেই দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখে দেখালেন : যা সংস্কৃতের মতোই যুক্তাক্ষরে জোড়া বা দু-মাত্রা দিয়ে পড়তে হবে। সেই কবিতা,

'ইচ্ছা সম্যকে জগদরশনে
কিন্তু পাথেয় নাস্তি
পায়ে শিক্লি মন উড়ু উড়ু
এ কি দৈবের শাস্তি!
টঙ্কাদেবী করে যদি কৃপা
না রহে কোনো জ্বালা।
বিদ্যাবুদ্ধি কিছু না কিছু না
শুধু ভস্মে ঘি ঢালা।।'

দ্বিজেন্দ্রনাথের পত্রকাব্য, চিরকুট কাব্য -ইত্যাদি ছিল সরস ও বুদ্ধিদীপ্ত। শিক্ষক জগদানন্দ রায় একটি ছাত্রের কান মলছেন দেখে গৃহে ফিরে তিনি চিরকুটে লিখে পাঠালেন,

'শোনো হে জগদানন্দ দাদা,
গাধারে পিটিলে হয় না অশ্ব
অশ্বে পিটিলে হয় যে গাধা।'

রবীন্দ্রনাথের পঁয়ষট্টি বছর পূর্ণ হলে তিনি চিরকুটে লিখে পাঠালেন,

'চমৎকার না চমৎকার!
সেই সেদিনের বালক দেখো,
পঞ্চষট্টি হল পার।

কাণ্ডখানা চমৎকার
চমৎকার না চমৎকার!'

অনুজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শিরোমিতি-বিদ্যার চর্চার জন্যে সকলের প্রতিকৃতি আঁকছেন, তখন দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ একটি কবিতায় লিখলেন,

'...মাথার তত্ত্ব খুঁজি, পুঁথি করেন পুঁজি
মাথা পেলে আর কিছু চান না।
লব যবে ছবি মনে ভাবে কবি
'হইয়াছে, থামো-আন্না,
চক্ষে আসিয়াছে মোর কান্না।'

পৌত্র দিনেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন,

'দিনু দাদাজির কি কব কাহিনী
বীণাপাণির সে যে শিষ্য!
উথলি উঠে যবে রাগরাগিণী
পুথলি বনি যায় বিশ্ব।'

দিনেন্দ্রনাথও পত্রকাব্য, চিরকুটকাব্য-রচনার পরম্পরা পিতামহের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন।

একবার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সুরবালা রায় ও জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার 'যাঁহার কুবেরের ন্যায় সম্পত্তি, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধি, যমের ন্যায় প্রতাপ' এহেন যে দ্বিজেন্দ্রনাথ, তিনি 'আপনার ভবনের নন্দন-কানন ছেড়ে' তাঁর পদ্মপলাশবসনা ভামিনীকে নিয়ে স্বর্ণশকটে চড়ে আমন্ত্রকদের গৃহে 'শ্রী চরণের পবিত্র ধুলি' ঝেড়ে আমন্ত্রকদের চোদ্দো পুরুষকে উদ্ধার করার নিমন্ত্রণ জানালে দ্বিজেন্দ্রলাল 'গীতগোবিন্দ'-এর ধাঁচে পত্রকাব্য লিখে বলেন

'ন চ সম্পত্তি ন বৃহস্পতি, যম প্রতাপ নাহিক মে।
ন চ নন্দনকানন স্বর্ণসুবাহন পদ্মবিনিন্দিত পদযুগ মে।
আছে সত্যি পদরজরত্তি — তাও পবিত্র কে জানিত মে।
চৌদ্দপুরুষ তব প্রাণ পায় যদি, অবশ্য ঝাড়িব তব ভবনে।
কিন্তু-মেঘাচ্ছন্নে শনি অপরাহ্ণে যদি গুরু বাধা না ঘটে মে
কিংবা যদ্যপি সহসা চুপিচুপি প্রেরিত না হই পরধামে।'

সংস্কৃত ছন্দ নিয়ে এমন সরস কাণ্ডকারখানা বাংলা কাব্যে অভিনব। এমন অবলীলায় সংস্কৃতের গুরুগম্ভীর ছন্দের চাল-কে বাংলায় লঘু হাস্যেপরিহাসে চারিয়ে যে দেওয়া যায়, যে-কোনো সংস্কৃত ছন্দে যে বাংলা কবিতা লেখা যায়, এমন কথা মাইকেল মধুসূদনও ভাবতে পারেননি। অথচ লোকমুখে এমন কাহিনী চলিত ছিল যে, প্রচুর ফসল হয়েছে জেনে পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর এই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে খাজনা ও নাজাই আদায়ের জন্য জমিদারিতে পাঠালে, গ্রামের দুরবস্থা দেখে কাতর এই কবি-পুত্রটি পিতাকে তার করেন 'সেন্ড ফিফ্‌টি থাউজেন্ড' এবং বলা বাহুল্য ফেরত ডাকেই পিতার প্রত্যুত্তর গেল, 'কাম ব্যাক'। শান্তিনিকেতনেই যে তাঁর

বৈষয়িক বুদ্ধির হালচাল দেখে আশ্রমিকরা বেশ মজা পেতেন, তাও কেউ-কেউ জানিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর দামি শাল ভিখিরিকে দিয়ে দিতেন, তাই তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূ যাঁরা অন্য গৃহে থাকতেন তাঁরা নিরুপায়বশেই এই মানুষটির হাতে পয়সাকড়ি দিতেন না। রবীন্দ্রনাথ যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন তাঁর বিদ্যালয়কে বাঁচাবার জন্যে এবং বিদ্যালয়কর্মীদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থার জন্যে দিক-বিদিকে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দৌড়োতেন। দুই ভাইয়ের জীবনের এই দিকটি কোনো স্মৃতিচারণেই মমতার সঙ্গে কেউ দেখেননি। দ্বিজেন্দ্রনাথের অন্তরে একই সঙ্গে রসিক ও বিবাগির সহাবস্থান আশ্চর্যভাবে ছিল। দর্শনের দুরূহ তত্ত্ব যাঁর ছিল নখদর্পণে, কাব্যের জটিল অন্ধিসন্ধিতে তাঁর যাতায়াত ছিল হাওয়ার মতো অবাধ, হাস্য পরিহাসেও যিনি ছিলেন তুলনাহীন, আবার গণিত্যের মধ্যেও যিনি দেখতেন সামঞ্জস্যের সুষমা—তেমন একজন মানুষ বিষয়-আশয় সম্পর্কে কি করে এমন উদাসীন ছিলেন, চরিত্রের এই বৈপরীত্যের ব্যাপার ছিল বিস্ময়কর।

এমনকী নিজের রচনার গ্রন্থনেও তিনি ছিলেন উদাসীন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে 'স্বপ্ন-প্রয়াণ'-এর পৃষ্ঠা বাড়িময় উড়ে বেড়াত। লেখার তাগিদে তিনি লিখতেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল ভিতরকে লেখার মাধ্যমে উন্মোচন করা। ফলের আশা তিনি কদাচ করেননি। নিজেকে এতটুকুও গুছিয়ে রাখার স্বভাবের অভাবেই তিনিও নিজেকে বিস্মৃত হতে সহায়তা করেছেন।

'রেখাক্ষর-বর্ণমালা'র পর তাঁর কবিতার সংকলন 'কাব্যমালা' প্রকাশিত হয় উনিশশো কুড়িতে। এই 'কাব্য-মালা'য় 'যৌতুক না কৌতুক' ('ভারতী', জ্যেষ্ঠ, বারোশো নব্বই), 'গুম্ফ-আক্রমণ কাব্য' ('ভারতী ও বালক', ফাল্গুন, বারোশো ছিয়ানব্বই), 'মেঘদূত' (পুস্তকাকারে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গ্রন্থ, বারোশো সাতষট্টি), 'সেরা মালি' ('ভারতী' অগ্রহায়ণ, তেরোশো আট), 'অন্তিম বাসনা' ('ভারতী', ভাদ্র বারোশো পঁচাশি), 'বাসন্তী-পদাবলী', 'তেতলায় দুপুররাত্রি', 'বরাহ-নগরের উদ্যানে' এবং 'পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম' (প্রথমে পুস্তকাকারে মুদ্রিত, বৈশাখ তেরোশো পাঁচ) সংকলিত হয়েছিল। 'পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম' ছাড়া বাকিগুলি আখ্যানমূলক। পিতা দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের মন্ত্র সংকলন করে 'ব্রহ্মোপনিষদ' প্রকাশ করেছিলেন। পুত্র সেই গম্ভীর তত্ত্বকে বাংলা কবিতার অবয়বে সুগম করেছিলেন.

'কাব্য-মালা'র কবিতাগুলিতে পাঠক উনিশ শতকের কবি-সমাগমে দ্বিজেন্দ্রনাথের ভিন্ন স্বর সহজেই চিনে নিতে পারবেন। তাঁর কবিতায় অজস্র তত্ত্বকথা আছে। উনিশ শতকের কবিরাই প্রথম জনসমক্ষে ছাপা বইয়ের মাধ্যমে এসেছিলেন। ছাপা বইয়ের আগের যুগের কবিরা ছিলেন সভাকবি বা কবিওলা বা সাধক, ভারতচন্দ্র, ভোলাময়রা, রামপ্রসাদ। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ 'চৌরপঞ্চাশিকা'র পরম্পরায় 'বিদ্যাসুন্দর' লিখেছিলেন। বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন, 'বাংলাদেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্যে মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তা, হুতুম পেঁচার ন্যায় লেখক এবং ভোলা ময়রার ন্যায় কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব বড়োই আবশ্যক।' ভারতচন্দ্র ও ভোলা ময়রা কবিতা বেঁধেছিলেন মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে, রামপ্রসাদও সেই

লক্ষ্যেই 'বিদ্যাসুন্দর' লিখেছিলেন। ছাপাখানার মাধ্যমে উচ্চবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে যে সকল কবিরা উঠে এসেছিলেন, তাঁরা ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে বা মনোরঞ্জনের লক্ষ্যে কবিতা লিখলেন না। তাঁদের অবস্থান ছিল ভিন্নতর। এই ভিন্ন অবস্থান থেকে কবিতায় তাঁরা ইচ্ছেমতো ছন্দ নিয়ে, আঙ্গিক নিয়ে, শব্দালঙ্কার-অর্থালঙ্কার নিয়ে পরীক্ষা করতে পেরেছিলেন। এই স্বাধীনতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার দ্বিজেন্দ্রনাথ করেছিলেন। এই নতুন কবিগোষ্ঠী মনোরঞ্জনের দায় থেকে মুক্ত এক কাব্যভাষাও নিয়ে এলেন। এই কাব্যভাষা ক্রমে যে সুভদ্রশীলিত রূপে উত্তীর্ণ হল, তার অন্যতম রূপকার দ্বিজেন্দ্রনাথ। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে বলা হয়, কবিওলা বা কবিয়াল-রীতির শেষ কবি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর পরম্পরা যেখানে শেষ, সেখান থেকে বাংলা কবিতায় নতুন পরম্পরার ধারক ও বাহক হিসেবে দেখা দিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার (জ. আঠারোশো সতেরো), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (জ. আঠারোশো চব্বিশ), রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (জ. আঠারোশো সাতাশ), দীনবন্ধু মিত্র (জ. আঠারোশো ত্রিশ), মনোমোহন বসু (জ. আঠারোশো একত্রিশ), কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (জ. আঠারোশো চৌত্রিশ), বিহারীলাল চক্রবর্তী (জ. আঠারোশো পঁয়ত্রিশ), হরিশচন্দ্র মিত্র (জ. আঠারোশো আটত্রিশ), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (জ. আঠারোশো আটত্রিশ) এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (জ. আঠারোশো চল্লিশ)। তাঁর এই অবস্থান মনে রেখে তাঁর কবিতা পড়লে আমরা বাংলা কবিতায় তাঁর ভূমিকা বুঝতে পারব।

ঠাকুরবাড়ির গীতিকার-সুরকারদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের পরই তাঁর নাম স্বাভাবিক অনুক্রমে আসে। ভারতের জাতীয় সংগীত রচয়িতাদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ। দ্বিজেন্দ্রনাথের অন্যতম ভারত-সংগীত,

'নটবেহগে পোস্তা
মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি।
দিবা রাত্রি ঝরিছে লোচন-বারি॥
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে, ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি।
এ দুঃখ তোমার হৃদয়ে সহিতে না পারি॥'

উনিশ শতকে রচিত রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ও পূজা পর্যায়ের গানে দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিচ্ছায়া দেখা যায়।

তদুপরি, রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রবেশক হিসেবেও দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিতার এক বিশেষ গুরুত্ব আছে। সংস্কৃত কাব্যের বহু চিত্রকল্প রবীন্দ্রনাথ যে তার এই অগ্রজের অনুবাদে বা কবিতা রচনায় প্রথম পাঠ করেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সেই সকল চিত্রকল্প এসেছিল দ্বিজেন্দ্রনাথের মাধ্যমে, যেমন 'রাজার পুরে তমাল গাছে নূপুর শুনে ময়ুর নাচে', 'অশোককুঞ্জ উঠতে ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে,/বকুল হত ফুল্ল প্রিয়ার মুখের মদিরাতে' -ইত্যাদি। তদুপরি, রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই তাঁর অগ্রজেরা তাঁদের বহুমাত্রিক সৃষ্টিশীল তৎপরতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন কবি, গীতিকার, সুরকার ও চিত্রকর। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানী, গণিতবিদ্যায় অশেষ প্রতিভার অধিকারী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন নট, নাট্যকার, ব্যবসায় উদ্যমী। রবীন্দ্রনাথের এই দুই অগ্রজই 'বিদ্বজ্জন-সমাগমে' তাঁদের ছোটো ভাইকে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র মাধ্যমে উপস্থিত করিয়েছিলেন, বাংলার সারস্বত সমাজে হাত ধরে তুলে এনেছিলেন। রবীন্দ্রজীবনীর তথা রবীন্দ্রপ্রতিভার অধ্যয়নে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ তাই বারবার আসেই।

দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'মেঘদূত'; প্রকাশকাল আঠারোশো ষাট। উনিশশো কুড়িতে 'কাব্য-মালা'য় এটির পরিমার্জিত রূপ প্রকাশিত হয়। তিনি নিজের রচনায় বারবার পরিবর্তন ঘটাতেন, যা করতেন তাঁর অনুজ রবীন্দ্রনাথও। আমরা এই সংকলনে 'মেঘদূতে'র শেষ পাঠই গ্রহণ করেছি। যে চূর্ণ কবিতাগুলির উদাহরণ এই ভূমিকায় দেওয়া হল, এগুলিরও পাঠান্তর আছে। নানা সূত্রে উল্লিখিত হলেও এগুলি সংকলিত হয়নি। বিশ্বভারতীর ভান্ডারে গচ্ছিত এই সম্পদ জনসমক্ষে নিয়ে আসার কোনো উদ্যম সেই প্রতিষ্ঠান করেননি। গ্রন্থিত দ্বিজেন্দ্রনাথই এখন দুর্লভ; অগ্রন্থিত দ্বিজেন্দ্রনাথের কথা কে ভাববেন?

২৩ জানুয়ারি, ২০০২ — শোভন সোম

কলকাতা

সূ চি প ত্র

ব্রহ্মসংগীত :

স্বপ্ন-প্রয়াণ

১৮৭৫

প্রথম সর্গ :

মনোরাজ্য-প্রয়াণ

সূচনা

স্বপ্নের কুহক। মনোরথ যাত্রা। অনেক দিনের পরে কল্পনার দর্শন-প্রাপ্তি।

সুপ্তিতে ডুবিয়া-গেল জাগরণ,
সাগর-সীমার যথা অস্ত-যায় জ্বলন্ত-তপন।
স্বপন-রমণী
আইল অমনি,
নিঃশব্দে যেমন সন্ধ্যা করে পদার্পণ ॥১॥

সুকোমল চরণ-কমল দুটি
ছোঁয় কি না-ছোঁয় মাটি, আঁচল ধরায় পড়ে লুটি ;
করে পদ্ম-ফুল
করে দুল-দুল
অলসিত আঁখি-সম আধো-আধো ফুটি ॥২॥

কবির শিয়রে গিয়া, ধীরে ধীরে,
বুলাইল শতদল মুখে চক্ষে নাসিকায় শিরে।
পরশের বশে
মোহ-বন্ধ খসে,
অচেতন কবির চেতন আসে ফিরো ॥৩॥

অচেতন চেতন! ঘুমন্তে জাগা!
সকলি বিচিত্র স্বপনের কান্ড! গোড়া নাই আগা!
স্বপ্নের কৃপায়
অন্ধে আঁখি পায়,
ঐশ্বর্যে কাঁপিয়া উঠে দরিদ্র অভাগা ॥৪॥

ছায়া-রূপা রমণী সুযোগ ভাবি
কবির মনো-মন্দিরে খুলি-দিল রহস্যের চাবি।

দেখিতে-দেখিতে
অমনি চকিতে
এল ছায়া-পথ দিয়া রথ এক নাবি ॥৫॥

মনোরথ নাম তার, কামচারী ;
আরোহিল তাহে কবি, স্বপনের হয়্যে আজ্ঞাকারী।
অমনি বিমান
করে গাত্রোত্থান,
চালায় সারথি হয়্যে কল্পনা-কুমারী ॥৬॥

দেখিতে না-দিয়া, কোথা কোন্ স্থান,
নিমেষে ধরার ধরা এড়াইয়া, চলিল বিমান।
গিরিবর তায়
ভূতলে মিশায়,
সমুদ্র হইয়া ক্ষুদ্র লভিল নির্বাণ ॥৭॥

কবিবর নাহি জানে কোথা রয় ;
ক্ষণে ভয়, ক্ষণেকে সাহস হয়, ক্ষণেকে বিস্ময়।
কিছু কাল পরে,
আকুল অন্তরে,
সারথিরে উদ্দেশিয়া সম্বোধিয়া কয় ॥৮॥

"কোথায় গো সারথি! তোমারে ধন্য!
নাহি দিক্‌বিদিক্! অগম শূন্য! হেথায় কি জন্য!
মুখে নাই কথা,
এ কেমন প্রথা!
চাও গো আমার পানে হইয়া প্রসন্ন ॥"৯॥

কিবা রাস-গুচ্ছ বাগাইয়া-ধরি,
মুখ ফিরাইল কলপনা-বালা মৃদু হাস্য করি!
কবিবর তায়
কি যে ধন পায়,
এক দৃষ্টে চাহি-রয় সকল পাশরি ॥১০॥

কেবা আর কাহারে করে জিজ্ঞাসা!
স্তব্ধ-পুলকিত-ছবি কবিবর, মুখে নাই ভাষা!
কথা যাহা কিছু
পড়ি-রহে পিছু,
হেরিতে বদন-বিধু নয়ন-পিপাসা ॥১১॥

কোথা গেল কবির বাক্য-বিভব!
আনন্দের হিল্লোলে ভাসিয়া-গেল মুহূর্তে সে সব!
জাগি উঠে ভয়
স্বপ্ন এ তো নয়?
কবি কহে "স্বপ্ন নহে, এ দেখি বাস্তব ॥১২॥

"সেই দেখি বদন, সুধার খনি!
সেই আঁখি, জীবিতের মরণ, মৃতের সঞ্জীবনী!
ফেলিয়া আমায়
আছিলে কোথায়!
কাঁদিয়াছি তোমা-লাগি দিবস-রজনী ॥১৩॥

"কত কাল পরে আজি ভাগ্যোদয়!
পূর্বে সে যখন তুমি দেখা-দিতে, সে এক সময়!
জাগিছে সে সব,
যেন অভিনব!
যতনের বস্তু সে যে বচনের নয়! ১৪॥

"বেড়াতাম কত খুশিতে-হাসিতে!
বারেক না মনে হত, পরিচয় তব জিজ্ঞাসিতে!
শুধু জানিতাম
কলপনা নাম,
নব নব সাজি সাজ, ছলিতে আসিতে! ১৫॥

"এখন আবার, একি চমৎকার!
রথ লয়্যে আসিয়াছ, সারথির ধরিয়া আকার!
অশ্ব, তেজে ভরা,
মৃদু হস্তে মরা!
চারুতার কাছে আর দর্প খাটে কার! ১৬॥

"যাইতেছ কোথায়, বল তো শুনি!"
"মনোরাজ্যে যাইতেছি" হাস্য-মুখে কহিল তরুণী।
শুনি, মনোরাজ্য
হয়্যে অনিবার্য,
"লয়্যে চল লয়্যে চল" বলি-উঠে গুণী ॥১৭॥

"মনোরাজ্য নামটি মধুতে ভরা!
ফুটে যথা পারিজাত, বিচরে গন্ধর্ব-অপসরা!

দলি স্বর্ণরেণু
চরে কামধেনু!
কল্পতরু-ছায়া-তলে রত্নে হাসে ধরা ॥১৮॥

"তোমাসঙ্গে তথায় না যাব যদি
কেন তবে এতেক সাধ্য-সাধনা শৈশব-অবধি।
অই মম তপ,
অই মম জপ,
অই চাঁদে উনমাদ বাসনা-জলধি ॥"১৯॥

কবিবর বচন করিতে সাঙ্গ,
কল্পনা মধুর হাসি, হরি-লয়ে হরিণ-অপাঙ্গ,
শিথিল-আয়াসে
লোল-দিল রাসে ;
তেজে গরবিয়া-উঠি ধাইল তুরঙ্গ ॥২০॥

মনোরাজ্য ক্রমে হৈল সন্নিকটে ;
দূর-হৈতে মনে লয়, শোভে যেন চিত্র অকপট।
গিরি নদী বন,
হর্ম্য সুশোভন,
স্তরে স্তবে শোভা-করে দিগন্তের পট ॥২১॥

সম্মুখে তোরণ-দ্বাব শক্র-ধনু
ভিতবে সরসী হাসে, চন্দ্র-ভাসে পুলকিত তনু।
ঘন বনচ্ছায়
কজ্জলের প্রায়
তীরে যথা নীরে তথা, ভেদ নাহি অণু ॥২২॥

থামিল তুরঙ্গ-রাজি ক্ষণ-পরে ;
"নাম কবি এই ঠাই" কল্পনা কহিল মৃদুস্বরে।
নামিলে সে গুণী,
কল্পনা-তরুণী
নামিল, মরাল যেন কেলি-সরোবরে ॥২৩॥

"রম্য এ যে উপবন!"
কহে কবি তখন,
ফিরাইয়া নয়ন,
চৌদিক-পানে।

"পুষ্প-লতা মিলি-জুলি.
সমীরে হেলি-দুলি,
করিছে কোলা-কুলি,
অভেদ প্রাণে॥
পথ দিব্য দেখা-যায়
জ্যোৎস্নার কৃপায় ;
হেলিয়া, তরু, তায়
ছায়া বিছায়।
নিকুঞ্জে ডাকিছে পিক,
নিভৃত চারি দিক,
নয়ন অনিমিক,
ফিরান দায় ॥"২৪॥

দ্বিতীয় সর্গ :
নন্দনপুর-প্রয়াণ
সূচনা

কবির বাল্যকালের আনন্দ-নিকেতন। কবি বাল্যকালে চিত্রকর্ম সংগীত এবং প্রকৃতির শোভা লইয়া যেরূপ আনন্দে থাকিত—পুনর্বার সেই সকল পুরাতন কাহিনীর সহিত আলাপ পবিচয়। সাত্ত্বিকা (সত্ত্বগুণ) কবিকে পথ দেখাইয়া মায়ামাতার সন্নিধানে লইয়া গেল। রাজসী (রজোগুণ) কবির মনকে কল্পনার প্রতি প্রধাবিত করিল। তামসী (তমোগুণ) কবির মনকে বিষাদের হ্রদে ডুবাইয়া দিল। কল্পনার তিন সখী সুরুচি, মাধবী, শরণ্ময়ী। সুরুচি কিনা কাব্য-রসাস্বাদন-শক্তি—রসজ্ঞতা। মাধবী কিনা বাসন্তী ভাব—মাধুর্য-গুণ। শরণ্ময়ী কিনা শারদীয় ভাব—প্রসাদ-গুণ।

"আশ্চর্য এ দেশ" কহে কবিবর
"কোথায় আনিলে তুমি আমায়! কি দিব্য সরোবর
শোভিছে অদূরে!
কোন্ সুরপুরে
এলাম না জানি, ধরি মর্ত্য-কলেবর ॥১॥

"আহা! আহা! সুমন্দ মৃদু সমীর
ফুলের প্রাণের কথা আনিতেছে করিয়া বাহির!"
কহিল কল্পনা
"এসেছ অল্প না—
কেমন দেখিছ এই সরোবর-তীর? ২॥

"দু-দন্ড জিরাও বসি এই ঠাঁই।
আমি গিয়া আতিথ্যের আয়োজন করিয়া পাঠাই।
সঙ্গী এক জন
আসিবে এখন,
বলিও-কহিও তারে যখন যা চাই ॥৩॥

ধর এই ফুল-মালা, নব-যাত্রি ;
মায়া-দেবী রাখুন তোমায় সুখে, বন-অধিষ্ঠাত্রী।"
বলিয়া অমনি
নাহি সে রমণী!
অন্ধকারে ডুবিল গো পূরণিমা রাত্রি ॥৪॥

"হায়! হায়! কলপনা গেল চলি!
কেন আর পিকবর কুহরে, গুঞ্জরে কেন অলি!
কেন আর মিছে
সমীর বহিছে!
কল্পনা যখন গেছে, গিয়াছে সকলি!" ৫॥

স্বপ্নাবেশে পাইয়া বিপুল ধন,
জাগে যথা দীন-দুঃখী মণি-হারা ফণীর মতন,
কবির সহসা
হল সেই দশা ;
স্বর্গ-হতে রসাতলে দারুণ পতন! ৬॥

হেন-কালে দেখা-দিল সখ্য-রস ;
করে কুসুমের গুচ্ছ, মুখে হাসি, নবীন বয়স।
না জানি, যুবক,
কি জানে কুহক,
করিল কবির মন মুহূর্তেকে বশ ॥৭॥

সখ্য-রস যেমন আইল কাছে,
কবিবর উঠিয়া নিকটে গিয়া, সংসর্গ যাচে।
সখ্য মৃদু হাসি
কুশল জিজ্ঞাসি,
ঢালিল মধুর বাণী সুললিত ছাঁচে ॥৮॥

"কবিত্ব যে, কি বিত্ত, জানি তা আমি ;
যশের সৌরভ-বশে আসিয়াছি, কাব্য-রস-কামী।

যেইরূপ অলি,
মধু-কুতূহলী,
কুসুমের সুগন্ধের হয় অনুগামী ॥"৯॥

কবি কহে "তব আগমনে আজ
কবিত্ব-কাননে মোর দেখা-দিল নব ঋতুরাজ।
তব সু-পবনে
কাব্য-উপবনে
ফুটিয়া সুগন্ধি ফুল করিছে বিরাজ ॥১০॥

"কোন্ জাতি, কি নাম, কোথায় বাস,
কুশল বারতা কহি পুরাও মনের অভিলাষ।
কোথা হতে আসা,
কোন্ ঠাঁই বাসা?
না শুনিলে বিবরণ নাহি মিটে আশ ॥"১১॥

হাস্য-মুখে কহে তবে সখ্য-রস,
"পথ-কষ্টে গিয়াছে তোমার আজি সমস্ত দিবস,—
উঠাইলে গল্পে,
ফুরাবে না অল্পে,
দীনের কুটিরে হোক্ চরণ-পরশ ॥"১২॥

"এই ঠাঁই আছি ভাল" কহে কবি।
সখ্য বলে "জাগিয়া উঠিল যেই মলয় সুরভি—
কি কষ্টের লাগি
নিশ্বাস তেয়াগি
শিহরিলে? মুখে কেন বিষাদের ছবি ॥"১৩॥

"পথে কোন কষ্ট নাই" কহে কবি,
"যাতায়াতে অমন হইয়া-থাকে ম্লান মুখ-চ্ছবি ;
সকলেরি হয়,
মোর শুধু নয়!"
এত বলি নিশ্বাসিল শান্তি নাহি লভি ॥১৪॥

ডাকে সখ্য "কোথায় গো দাস্য-রস ;"
ভৃত্য এক আইল মুহূর্তে মাঝে, না করি আলস।
বস্ত্র বিছাইয়া,
দ্রব্য গুছাইয়া,
হস্ত দুই করি-লয় স্বাধীন স্ববশ ॥১৫॥

ধোয়াইয়া কবির চরণ-তল,
সুবাসিত, সুরঞ্জিত, পরাইল বস্ত্র নিরমল।
তুলিয়া চম্পক,
রচিয়া স্তবক,
হস্তে দিল, ঘ্রাণে হল পরাণ বিকল ॥১৬॥

ফল-মূল মিষ্টান্ন, সায়াহ্ন কালে,
নিবেদিল কবিবরে সাজাইয়া সুবর্ণের থালে।
পাতিল তখন
রাঙ্কব-আসন,
মরকত মণিময় ঘাটের চাতালে ॥১৭॥

যেমন বসিল কবি সুখাসনে,
অমনি ঘুচিল ক্লম, পথশ্রম না রহিল মনে।
ইহা করি লক্ষ,
সুখী হয়ে সখ্য,
বিবরিয়া বলে সব পথিক-সুজনে ॥১৮॥

"সজ্জন-সেবায় আমি নিরলস,
গন্ধর্ব, নিবাস বিলাস-পুর, নাম সখ্য-রস।
নন্দনের পতি
আনন্দ-ভূপতি,
তাঁরি আজ্ঞাকারী আমি রজনী-দিবস ॥১৯॥

"মায়া-নামে আছেন বন-দেবতা,
রানী তিনি আনন্দ-নরপতির, সতী পতিব্রতা।
কল্পনা-কুমারী
কন্যা হন তাঁরি ;
পাইনু তাঁহারি কাছে তোমার বারতা ॥২০॥

"জ্যেষ্ঠ-পুত্র ভূপের, প্রমোদ নাম,
বসেন বিলাস-পুর-সিংহাসনে, ছাড়ি নিজ ধাম।
প্রমোদ-যুবক
মাতার সেবক,
কিন্তু জনকের প্রতি কিছু যেন বাম ॥২১॥

মায়া তারে দিলেন বিলাস-পুর,
স্নেহের হইয়া বশ ; আমোদেই যুবা ভরপুর

সেই সে অবধি ;
সুখের জলধি
তলাইয়া দেখিবে পাতাল কতদূর! ২২॥

"এই যে দেখিছ দিব্য সরোবর,
এর নাম মানস ; নন্দন-পুর যেমন সুন্দর,
মানস সরসী
তেমনি আরসী—
কটাক্ষে নিখিল হয় নয়ন-গোচর ॥২৩॥

"ত্রিদিব হইতে নাবি মন্দাকিনী
মিলিয়াছে এ-দিকে ; ও-দিকে আর পাতাল-বাহিনী
ভোগবতী নদী ;
বলি সব যদি,
রাত্রি অবসান হবে, এত সে কাহিনী ॥২৪॥

"তরঙ্গিণী-দোঁহার সঙ্গম-মুখে
ওই শোভে বিলাস-নগরী, হোতা যাওয়া-যায় সুখে।
অনিল-হিল্লোলে,
বৃক্ষটি না দোলে,
আরামে ঘুমায় যেন দিগন্তের বুকে ॥" ২৫॥

কথা-বার্তা চলিতেছে অবিরাম ;
হেনকালে আইল গন্ধর্ব এক, সুদর্শন নাম :
চড়ি পুষ্পরথে,
এল শূন্য-পথে ;
আনন্দ-রাজার দূত নেত্র-অভিরাম ॥২৬॥

নামিয়া অভিবাদিয়া সমাদরে,
বলিল সে "স্মরিয়াছে নরপতি কবি-গুণধরে ;"
সখ্য বলে "আমি
হই অনুগামী ;"
উড়িয়া চলিল রথ ক্ষণকাল পরে ॥২৭॥

দিব্য এক বনোদ্যান-পরিসর—
মধ্যে এক অট্টালিকা! এই ঠাঁই গনধর্ব-বর
থামাইয়া রথ,
দেখাইয়া পথ,
আগে আগে চলিল, বলিল তার পর ॥২৮॥

"শুনিয়াছ অবশ্য অমরাবতী।
রাজ-অট্টালিকা তার, দেখ এই, শত-দ্বারবতী।
মনো-দেবতার
যত অবতার,
নিরখ তাঁদের এই সাধের বসতি ॥"২৯॥

সভায় পশিয়া পুলকিতচ্ছবি
দুয়ারের সন্নিধানে করযোড়ে দাঁড়াইল কবি।
নিরখিয়া নৃপে
নয়ন না তৃপে—
উদয়-শিখরে যেন বিরাজিছে রবি ॥৩০॥

নন্দনের ভূপতি আনন্দে গলি,
আলিঙ্গন করিলেন কবিবরে "এস বৎস" বলি।
প্রণমিয়া কবি
পদধূলি লভি
"ধন্য হইলাম" বলে হয়ে কৃতাঞ্জলি ॥৩১॥

সযতনে বসাইয়া কবিবরে
বলে ভূপ "শূন্য মোর পূর্ণ হল এত দিন পরে।
সেই তুমি কবি
ফিরিতে অটবি,
ঘরে না থাকিতে স্থির মুহূর্তের তরে ॥৩২॥

ধীর যুবা এবে দেখি মনোহর!"
চারিদিক্ নিরখিয়া ধীরে ধীরে কহে কবিবর,
"যেই কোন ঠাঁই,
নয়ন ফিরাই,—
সকলি আমার যেন প্রাণের দোসর ॥৩৩॥

"আবাস এ-যে আমার বারো-মেসে!
প্রথমে হইল মনে কোথায় পড়িনু আমি এস্যে?
পদে পেয়ে কূল
ভাঙি গেল ভুল—
বিদেশ হইতে যেন আইনু স্বদেশে ॥"৩৪॥

প্রমোদের ছোট' দুই সহোদরে
নিরখিল কবিবর ; হরষ-উল্লাস নাম ধরে

যমক সে-দুটি ;
আঁখি ফুট্‌ফুটি
হাসিতে লাগিল হেরি কবি-সুধাকরে ॥৩৫॥

মৈত্র বলে "অমন করিতে নাই ;"
হাসি বলে অনুরাগ "সমান চঞ্চল দুই ভাই!"
বলিল বাৎসল্য
"বালক-চাপল্য
বালকে না যদি রবে, রবে কোন্ ঠাঁই?" ৩৬॥

স্বাস্থ্য বলে "চাপল্যে সাফল্য আছে ;
বড় বৃক্ষে যেই ভার, সাজে কি তা ক্ষুদ্র চারা-গাছে?
বালক-রুধির
হয় কভু ধীর ?
অর্থ-হীন কার্য নাই প্রকৃতির কাছে ॥"৩৭॥

দাক্ষ্য বলে "চাপল্য যেমন চাই,
শিক্ষা চাই তার সঙ্গে, দুই ভিন্ন একে শুভ নাই।"
বলিল কৌশল,
"দুয়ের মিশল
কেমনে ঘটিতে পারে ভাবিতেছি তাই ॥৩৮॥

"আগে দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা.
তার পর শিক্ষা-দান ; এক বিন্দু দোষের সূচনা
নাহি পায় স্থান—
চাই অবধান ;
দুধে না পড়ে গো যেন অম্ল-রস-কণা ॥"৩৯॥

বলিলেন ভূপতি বালক-দ্বয়ে,
"ঘরে যাও এখন ;" চলিল দোঁহে ভিতর-আলয়ে।
বাৎসল্যের প্রতি
চাহি নরপতি,
বলিলেন "কি ভাবিলে প্রমোদ-বিষয়ে ॥৪০॥

"সভাসদ সবে আজি উপস্থিত,
খুলি-বল নিজ-নিজ অভিপ্রায় বাছি হিতাহিত।
যা বলিবে তার
মন্থি লব সার,
বিবেচিয়া তার পর করিব বিহিত ॥"৪১॥

বাৎসল্য বলিল তবে "নরপতি,
বিশেষ একটু বিবেচনা চাই প্রমোদের প্রতি।
বয়স যেরূপ
তারি অনুরূপ
আচরণ হইয়াছে তাহার সম্প্রতি ॥৪২॥

"যৌবনের বাতাস লাগিলে গায়,
মনো-অশ্ব উদ্দাম হইয়া উঠি উর্ধ্ব-মুখে ধায়।
কে তখন তারে,
ফিরাইতে পারে?
ঠেকিয়া, আপনি ফিরে, পথের বাধায় ॥৪৩॥

"অপরাধী সে জন মানিনু আমি,
কিন্তু দূত পাঠাইল সে যখন অনুগ্রহ-কামী,
তখন কি তারে,
অকূল পাথারে
ফেলি রাখা উচিত, নন্দনপুর-স্বামি? ॥৪৪॥

নিবেদিল কৌশল "বল্যেছ ঠিক ;
কিন্তু বিবেচনা চাই,—প্রিয় যার বিলাসের দিক্,
বিনা-প্রলোভনে
নন্দন-ভবনে
তিষ্ঠিয়া-থাকিতে নারে ক্ষণের অধিক ॥৪৫॥

"সংযম যাহার নাহিকো সাধা,
শ্রেয়-পথে ফিরিতে আপনি হয় আপনার বাধা।
ছাড়া পেলে অশ্ব,
ছুটিবে অবশ্য ;
ভক্ষ্য দেখাইয়া এবে, তারে চাই বাঁধা ॥৪৬॥

"যৌবরাজ্য প্রলোভন উপাদেয় ;
তাই তারে অনুমতি কর ভূপ , তনয়ে অদেয়
কি আছে পিতার?
পেলে রাজ্য-ভার ?
অবশ্য বাছিতে হবে শ্রেয় আর প্রেয় ॥"৪৭॥

মৈত্র বলে "যদিও বিলাস-পুর
চির-বসন্তের বাস, পাতাল নহেক বড় দূর

সে স্থান-হইতে ;
দানব-সহিতে
সতত সংগ্রাম বাধে দারুণ নিষ্ঠুর ॥৪৮॥

"দূত-মুখে প্রমোদ কহিছে এই,
অন্বেষিয়া জানিলাম শত্রু মোর সকল দিকেই ;
যদি মোর প্রাণ
বাঁচাইতে চান,
সহায় পাঠান পিতা এই মুহূর্তেই ॥" ৪৯॥

"সহায়-প্রেরণে হোক্ অনুমতি
নহিলে যা দেখিতেছি-শুনিতেছি ভাল নহে গতি।
শাসাইছে তারে,
দর্প-সহকারে,
ভয়ানক রস নামে রসাতল-পতি ॥" ৫০॥

অনুরাগ বলিল "বিলম্ব করা
ভালো না দেখায় আর ; শুভ কাজে সাজে ভালো ত্বরা।
অক্ষৌহিণী-দশ
লয়ে বীররস,
নাশুক্ দানব-দর্প, শান্ত হোক্ ধরা ॥৫১॥

বীর-সঙ্গে সমরে পশিব আমি ;"
সভাস্থ সকলে বলে "মোরা-সবে হব অনুগামী ;
কর এইবার
প্রমোদে উদ্ধার ;
যুবা সে আপনি নয় আপনার স্বামী ॥"৫২॥

দাক্ষ্য বলে "যৌবরাজ্যে অভিষেক
কর তারে ভূপতি, সময় যেন না পায় তিলেক
করিতে বিশ্রাম ;
চারি চারি যাম,
কর্ম-গাছে করে যেন ঘর্ম-জল-সেক ॥" ৫৩॥

স্বাস্থ্য বলে "কাজের সময় কাজ,
বিশ্রামের সময় বিশ্রাম চাই ; একরূপ সাজ
সাজে না নিয়ত ;
আপনার মত
আপনিই চলিবেন, হলে যুবরাজ ॥"৫৪॥

সমাপিলে মন্ত্রণা বলিল ভূপ
"শুনিলাম তোমাদের অভিপ্রায় যাহার যেরূপ।
সকলি সুযুক্তি
সকলি সদুক্তি,
এতক্ষণ ছিনু তাই শ্রবণ-লোলুপ ॥৫৫॥

"কর্তব্য আমার এই মনে লয়,
সখ্য যাও তার কাছে, মুহূর্তেক বিলম্ব না হয়।
গিয়া তুমি তথা,
বল এই কথা,
সহায় আসিছে তব, দূব কর ভয় ॥৫৬॥

"দৈত্য-গণে সংগ্রামে করিয়া জয়,
বীরে দিয়া রাজ্য-ভার, ফিরি-চল নন্দন-আলয়।
নন্দন-নগরে
আনন্দ বিহরে,
নাহি রোগ, নাহি শোক, নাহি দুঃখ-ভয় ॥৫৭॥

"নন্দনের গিরি-চূড়া অভ্র-লিহা,
নন্দনের কানন লক্ষ্মীর বাস, বল তারে ইহা।
নন্দনের বায়
লাগে যদি গায়,
রসাতল-মগ্ন হবে বিলাসের স্পৃহা ॥৫৮॥

"যৌবরাজ্যে করি তারে অভিষেক,
শান্তি-ধামে যাব আমি, হইয়াছে বাসনা-উদ্রেক।
হেন বুঝাইয়া
আন ফিরাইয়া,
সংসার-বন্ধন-সেতু তুমি শুধু এক ॥৫৯॥

"এই পত্র সঁপিবে তাহার হাতে ;
বলিবার যা আমার, বলিলাম সমস্ত ইহাতে।
যাও হে ত্বরিতে ;
বিলাস-পুরীতে
দিবা হয় রজনীতে, নিশা হয় প্রাতে ॥"৬০॥

সখ্য বলে "পাইলে আদেশ-বাণী,
মুহূর্ত-কালের তরে বিলম্বিতে কভু নাহি জানি।

দিব্য এ সময় ;—
আজ্ঞা যদি হয়,
কবিরে বিলাস-পুর দেখাইয়া আনি ॥"৬১॥

নৃপ কহে "উত্তম ; সরস লোক
দেখুন সরস দৃশ্য, ক্রমে-ক্রমে খুলি যাবে চোক।
ত্রিজগতে নাই
হেন কোন ঠাঁই,
মনোরাজ্যে নাহি যার ভাবের আলোক ॥৬২॥

"কবি তুমি, তোমারে বারণ নাই—
বেড়াও যেখানে হয় অভিরুচি, তোমারি এ ঠাঁই!
ওহে চিত্ররথ,
শীঘ্র আনো রথ,
কবিবরে কিছু আমি দেখাই শুনাই ॥৬৩॥

"তার পরে যাবেন সখ্যের সনে।"
চিত্ররথ আনিল পুষ্পক-রথ সাজায়ে যতনে।
নৃপের পশ্চাতে
আরোহিয়া তাতে,
চলিল সভাস্থ-সবে প্রফুল্ল-বদনে ॥৬৪॥

হেতায় সরিৎ-সিন্ধু, হোতা গিরি,
হেতা তৃণ-ময়-ভূমি, চৌদিকে বনান্ত আছে ঘিরি।
মধ্যে এক হর্ম্য
বিরাজে সুরম্য,
দেব-রথ তথায় পশিল ধীরি ধীরি ॥৬৫॥

শোভা-নামে নৃপ-কন্যা এই ঠাঁই
বিহরেন সজনী-জনের সনে ; ভাসেন সদাই
রূপের তরঙ্গে ;
এবে সখি-সঙ্গে
গিয়াছেন বন-ভূমে, অদর্শন তাই ॥৬৬॥

চিত্র-লেখা নামে এক সহচরী
রথ-শব্দে চমকিয়া, নামি-এল কার্য পরিহরি ;
গমনে মন্থরা,
তবু করি ত্বরা,
দ্বার-পাশে দাঁড়াইল কর-যোড় করি ॥৬৭॥

"পবিত্র হইল ঘর" এত বলি,
প্রণমিল বালা নরপতি-পদে ভক্তিরসে গলি।
যথাবিধি আর
করিয়া সৎকার
দাঁড়াইল পার্শ্বে পুন হয়ে কৃতাঞ্জলি ॥৬৮॥

নৃপ কহে "কবি
দেখিবেন ছবি"
এত শুনি চিত্রলেখা মনোমাঝে হর্ষ অনুভবি
বলিল "আমার
সৌভাগ্য অপার—
রচনা নিরখিবেন কবিকুলরবি ॥৬৯॥

"নরপতি দেবের প্রসাদ-নীরে
তুলি করি মন্ত্রপূত রচিয়াছি আমি ধীরে ধীরে
এই সব ছবি!"
হেরি কহে কবি
"বন্দি হতে যায় সাধ এ তব মন্দিরে" ॥৭০॥

চিত্র বলে "সম্মুখে যে চিত্র-খানি,
বিরাজিছে অমল কমল-বনে দেবী বীণা-পাণি।
যুবতী নবীনা
বাজাইছে বীণা,
মনোময় স্বর্গ-হতে ভাব-সুধা আনি ॥৭১॥

"গড়ায় সরসী, দিগন্ত পরশি ;
চক্ চক্ করিছে অরুণ-আভা তদুপরি খসি ;
হংস-হংসী তায়,
ভাসি গায়-গায়,
পদ্ম-বনে ভিড়িছে মৃণাল অভিলাষি ॥৭২॥

"হের এই, সভার সমক্ষে সতী
মুদিয়া সজল আঁখি, প্রাণত্যাগে নিবেশিছে মতি।
কালা অভিমান
রোষে কম্পমান,
আর কি কোমল প্রাণ তিষ্ঠে একরতি! ৭৩॥

"হের এই, কতগুলো শুম্ভ দূত
বলিতেছে পরস্পর 'কুল-নারী একি অদভুত!'

চন্ডিকা-তরুণী
হাসিতেছে শুনি ;
গর্জ্জিছে কেশরী যেন প্রলয়-জীমূত ॥৭৪॥

"হের এই, খেলিতেছে তপোবনে
কুশ-লব ; জানকী দেখিছে বসি পূজার আসনে ;
এ আঁখি-কমল
বরষিছে জল,
এ আঁখি মুছিছে বামা বল্কল-বসনে ॥৭৫॥

"হের এই, নিরখিয়া হারা-ধন
যশোদা ধাইয়া-আসি চুম্বিতেছে কৃষ্ণের বদন।
শিশু ক্রোড়-তরে
আঁকু-বাঁকু করে ,
বাৎসল্যে মুদিত-প্রায় রানীর নয়ন ॥৭৬॥

"হের এই, অর্জ্জুন, নির্ভয়-হিয়া,
রথধ্বজে বাঁধিছে বিরাট্-সুতে বিরক্ত হইয়া ;
বালক বেচারা
ভয়ে জ্ঞান-হারা,
বীরের বদন-পানে আছয়ে চাহিয়া ॥৭৭॥

"হের এই, দিব্য তপোবন-দ্বারে,
উর্বশী নাহিছে সরে, অর্জ্জুনের সঙসর্গ-ভুখে।
বিরহ-বিধুর
মূরতি মধুর,
হয়েছে মধুর-তর মনোরথ-সুখে ॥৭৮॥

"হের এই, দিব্য তপোবন-দ্বারে,
সিংহেরে বলিছে শকুন্তলা-শিশু মুখ-মেলিবারে।
শকুন্তলা তায়
ভয়ে মৃত প্রায়,
কাঁপিতেছে দাঁড়াইয়া, ফুকারিতে নারে ॥"৭৯॥

এইরূপ কত দেখাইল দৃশ্য,
সংখ্যা নাই তাহার, নূতন যেন আরেকটি বিশ্ব।
বীর বিশ্ব-জয়ী,
মাতা স্নেহ-ময়ী,
সুন্দরী যুবতী যার নাহিক সাদৃশ্য ॥৮০॥

হেন-কালে এমনি মধুর গীত
পশিল কবির কানে, কবিবর অমনি মোহিত।
"কে গায়" বলিয়া,
চায় উতলিয়া,
"আহা আহা আহা" বলি চেতন-রহিত ॥৮১॥

গাইতেছে ভগিনী চিত্র-লেখার,
গান্ধর্বী যাহার নাম, পর নহে কবি এ-দোঁহার।
চিত্র কহে "কবি,
অই—গান্ধরবী
গাইছে ; শুনিবে যদি, খুল এই দ্বার ॥৮২॥

দ্বার খুলি দেখে কবি বন-ভূমে,
মধুময় জ্যোৎস্নায় জল-স্থল মগ্ন যেন ঘুমে,
চৌদিকে বিপিন,
শ্যামল নবীন,
মধ্যে তৃণ-ময়-ভূমি, খচিত কুসুমে ॥৮৩॥

ছুটিয়ে ফোয়ারা, হর্ষে মাতোয়ারা,
শূন্যে চড়ি উঠিয়া ধরিতে-যায় গগনের তারা।
না পেয়ে নাগাল,
ছাড়ি দিয়া হাল,
মনোদুখে অধোমুখে কাঁদি হয় সারা ॥৮৪॥

চারি-দিকে হইয়াছে জলাশয় ;
অল্প নহে পরিসর, সরোবর বলিলেও হয়!
প্রবল-হিল্লোলে
পড়ি তার কোলে,
ঝর্ঝর শবদে জল বেগে উথলয় ॥৮৫॥

কুমুদিনী-সদনে পড়িয়া খসি,
তল্ তল্ থল্ থল্ করিতেছে প্রতিবিম্ব-শশী।
এই ফোয়ারার
ঘিরি চারি ধার,
বসিয়া-আছয়ে সব নন্দন-রূপসী ॥৮৬॥

কাঁপিতেছে বনান্তের ডাল-পালা,
পুরনিমা নিশীথে ; যেমন স্থান তেমনি নিরালা!

শোভা এই ঠাঁই
আছেন সদাই
কখনো সজনী-সনে, কখনো একালা ॥৮৭॥

লজ্জা-সজ্জা এ দুই সখীর সনে,
বসিয়া-আছেন এবে রমণীয় পঙ্কজ-আসনে
অরুণ-বরণ
যুগল-চরণ
জাগায় পঙ্কজ-বন চারু পরশনে ॥৮৮॥

মুখ দেখি, মূক হল দিক্‌বধূ—
অনিমেষ হইল তারকা-আঁখি! কুমুদের বঁধু
না নড়ে না চড়ে—
পলক না পড়ে!
মলয়-মারুতচ্ছলে নিশ্বাসিল মধু ॥৮৯॥

ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী সনে,
গান্ধরবী গাইছে বাজায়ে বীণা মধুর-নিস্বনে।
নন্দন-রূপসী
শুনে সবে বসি,
গীত-রাগে বীত-রাগ বসন-ভূষণে ॥৯০॥

যতগুলি হরিণ আছিল জাগি
একে একে আসিয়া যুটিল তথি, কানন তেয়াগি।
নেত্র-কিসলয়
স্থির করি রয়,
নিদ্রা-তন্দ্রা পাসরিয়া স্বর-সুধা-লাগি ॥৯১॥

সভাসদ্‌-সহিতে নন্দন-স্বামী
দেখা-দিল যখন রমণী-গণে, বন-স্থলে নামি ;
মগ্ন ছিল সবে
স্বর-সুধার্ণবে,
কুহক ছুটিয়া-গেল গীত গেল থামি ॥৯২॥

গীত-ভঙ্গে কুরঙ্গ পলায় ছুটি,
কোকিলের কুহু-কুহু অমনি উঠিল আর ফুটি।
লজ্জা-সজ্জা সখী,
ভূপেরে নিরখি,
সংকেতিয়া সজনীরে দাঁড়াইল উঠি ॥৯৩॥

শোভা উঠি-দাঁড়ায় প্রফুল্ল-মনে,
স্নেহ-ভরে বলিল তাহারে ভূপ কবিবর সামনে,
"এঁরে তুমি চেন?"
শোভা বলে "হেন
মনে লয়, খেলিতেন কল্পনার সনে ॥৯৪॥

নৃপ বলে "লইয়া বেড়াও তুমি
কবিবরে সঙ্গে করি, বন যথা আছয়ে কুসুমি,
গিরি যথা উচ্চ
ধরা করে তুচ্ছ,
সরিৎ ত্বরিত বহে তট চুমি চুমি ॥৯৫॥

এত বলি নৃপতি ললিত ছাঁদে,
মৃদু-হাস্য-শীধুময় করিল শোভার মুখ-চাঁদে।
বলি-উঠে কবি
"ওই না অটবি
মায়া-মার! তাই বলি—প্রাণ কেন কাঁদে! ৯৬॥

"দেখিলেই আমায় সে বনেশ্বরী
ডাকিতেন কত স্নেহে, বসাতেন কত যত্ন করি!
কল্পনার সঙ্গে
ফুল তুলি রঙ্গে,
তাঁরে আনি-দিতাম আঁচল ভরি ভরি—॥৯৭॥

"কত তিনি শুনাতেন উপন্যাস!
বাহির না হতে শ্রীমুখের বাণী, করিতাম গ্রাস
মনোকর্ণে তাহা!
রাত্রি-দিন, আহা,
এই ঠাঁই ছিল মোর সাধের আবাস!৯৮॥

না হেরিয়া সে আমার জননীরে,
নড়িব না হেতা-হতে, অচল যদিও পড়ে শিরে!
নিরখিয়া মায়
হইব বিদায়;"
শোভা বলে "মা আছেন গহন-মন্দিরে ॥৯৯॥

"আইস লইয়া-যাই সাথে করি,
মায়ের সে নিকেতনে; আয় তোরা দুই সহচরী।"

এত বলি বালা,
পশে বন-শালা ;
কি সৌরভ, কিবা ছায়া, কিবা বিভাবরী!১০০॥

বনে যেই প্রবেশিল তিন সখী,
উস্‌-খুস্‌ করি-উঠে বিহঙ্গম, আলোক নিরখি।
মনে ভাবি "রাত
হল বা প্রভাত"—
ডাকে ক্ষান্ত দিল মুহু, চখা আর চখী! ১০১॥

দক্ষিণের দ্বার খুলি মৃদুমন্দ-গতি
বনভূমে পদার্পিয়া ঋতুকুলপতি
লতিকার গাঁটে গাঁটে ফুটাইল ফুল।
অঙ্গে ঘেরি-পরাইল পল্লব-দুকূল ॥১০২॥

কি জানি কিসের লাগি হইয়া উদাস
ঘরের বাহির হল মলয় বাতাস॥
ফুলের ঘোমটা খুলি কাড়য়ে সুবাস।
"এ নহে সে" বলি শেষে ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥১০৩॥

মনের আনন্দ আর না পারি রাখিতে,
কূজিতে লাগিল পিক বসিয়া শাখীতে॥
কুহু কুহু কুহু কুহু কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরে!
ক্রমে মিলাইয়া যায় কানন-গভীরে ॥১০৪॥

শোভা কহে "সুখরাজ্য এই মোর!
ধীরে ধীরে বনে ফিরি, শশী যবে লোভায় চকোর।
হেলি বট-মূলে
বসি নদীকূলে,
উদয়-শিখরে উঠি নিশি করি ভোর ॥১০৫॥

সরোবরে অই যে কমল-বন,
হোতা যাব একাকিনী, উষা যবে মেলিবে নয়ন।
আরো রাত্রি হলে,
কুমুদের কোলে
জ্যোছনা বিছানা পাতি করিব শয়ন ॥"১০৬॥

সন্ধ্যা বলে "দখিনে-বাতাস পেয়ে
ফুল ফুটিয়াছে দেখ! এত দিন ছিল পথ-চেয়ে—

কবে পিকবর,
আনে সু-খবর ;
আজি লো নিকুঞ্জ-বন ফেলিয়াছে ছেয়ে! ১০৭॥

লজ্জা বলে "হৃদয়ে পাইয়া পথ,
ফুলে ভুলাইতে, অলি, কত দেখ করিছে শপথ।
ফুলের মঞ্জরি
মুখ হেঁট করি,
সউরভ নিশ্বাসিয়া কহে মনোরথ ॥"১০৮॥

সজ্জা বলে "ও তোর বচন শুনি
কথা এক মনে পল ; ভ্রমিতেছি দু-জন তরুণী
সখী আর আমি ;
অমনি লো থামি
দাঁড়াইনু! নিরখিনু দেব-তুল্য মুনি! ১০৯॥

"বসি-আছে নয়ন মুদিত করি!
যাইতেও নারি, ফিরিতেও নারি, তরাসেই মরি!
মুনির নন্দন
আইল তখন,
বলিল 'আশ্রমে এস শঙ্কা পরিহরি' ॥১১০॥

"তার সনে হল যেই চোখোচখী,
সেই যে রহিল মুখ হেঁট করি আমাদের সখী,
একবারটি লো
মুখ না তুলিল!
মরমে পশিল বাণ নয়নে নিরখি!"১১১॥

লজ্জা বলে "কি হল তাহার পরে?"
সজ্জা বলে "মুনিপত্নী আমা-দোঁহে সে দিনের তরে
যতন করিয়া
রাখিল ধরিয়া ;
প্রত্যূষে বিদায় মাগি আইলাম ঘরে ॥১১২॥

"সত্য সে লো তপস্বী মুনির নাম ;
শ্রদ্ধা নাম ধরে ঠাকুরানী সতী, দোঁহারে প্রণাম।
তাপস-নন্দন
তপস্যারি ধন!
কল্যাণ তাহার নাম, পরে জানিলাম ॥১১৩॥

"পরানের মালা দিয়া তারি গলে
সারা হল সেই-সে অবধি সখী দহি মনানলে।
তেই দিবানিশি
ভ্রমে দিশি দিশি,
শয়ন ভিজায় আর নয়নের জলে ॥"১১৪॥

লজ্জা বলিল "হবে
কি লো তবে!
কতদিন পরান রবে,
অমন করি।
হইয়ে জল-হীন
যথা মীন
থাকিবে ওলো কত দিন
মরমে মরি!॥

হৃদয়ে খিল আঁটি,
একলা-টি,
বরণ করিবে কি মাটি,
মাটিতে শুয়ে!
বেদনা-সহচরী
বুকে করি,
পোহাবে কি লো বিভাবরী
কঠিন ভুঁয়ে!"১১৫॥

দু-সখী, এই রূপে, চুপে চুপে, কহিল কত।
শোভা, কবির সনে, আলাপনে, হইল রত॥
কখন চড়ে গিরি, ধীরি ধীরি ; কখনো সবে
নদীর ধারে ধারে, পদ চারে, নবোৎসবে ॥১১৬॥

কখনো বনে পশি, দেখে শশী, গাছের ফাঁকে।
কখনো হেরে দিক্, কোথা পিক না জানি ডাকে॥
উপরে শাখা ঝুলে, পদ-মূলে বিছান ঘাস।
শোভা বলিল "এই কাননেই মায়ের বাস ॥১১৭॥

হেরিলে তোমা-মুখ, কত সুখ মিলিবে তাঁর!
বলেন তোমা হীনা কবি বিনা ঘর আঁধার॥
এ সেই মায়াটবি, নাহি কবি, জন মানব।"
পশিল, এত বলি বনস্থলী ; নীরব সব ॥১১৮॥

যথায় মহাবট, শিরে জট, অতি নিবিড়,
পালিছে চুপে-চাপে, খোপে-খাপে, অযুত নীড়।
নমনা নামি নামি, উর্ধ্বগামী হইয়া উঠি
বহে বিপুল ভার ; অন্ধকার ধরে ভ্রূকুটি ॥১১৯॥

যে দিকে আঁখি যায়, ছায়ে ছায় সকল ঠাঁই।
ঝিলিলি ছাড়ে বোল উতরোল বিরাম নাই॥
হোতায় তালগাছে রহিয়াছে গগন ঢাকা।
আলসে ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া ঢুলিছে শাখা ॥১২০॥

হেতায় ঝর ঝর, ঝর ঝর, ঝরনা ঝরে।
পাদপ, মর মর, মর মর, শবদ করে॥
কি জানি, কোথা-হতে, বায়ু-পথে আসিছে গীত ;
বীণার ঝঙ্কার, হয় আর আচম্বিত ॥১২১॥

কোথাও নাই কিছু, আগু পিছু সংগীত চরে ;
শরীর লোমাঞ্চিত, কথঞ্চিৎ বচন সরে!
সুখে হইয়া দ্রব, যাত্রি-সব, আর না সয়ে্যা,
তৃণ-বিছান ভূঁয়ে, পড়ে শুয়ে্যা, অবশ হয়ে্যা ॥১২২॥

যেমন শুয়ে্যা পড়া, নড়া চড়া হইল ক্ষান্ত ;
করিল, ঘুম ঘোর, রসে ভোর, নয়ন প্রান্ত।
হাসে যেমন উষা, অকলুষা, পঙ্কজ-বনে,
নারী-মুরতি এক, হাসিলেক, নিদ্রিত জনে ॥১২৩॥

যেন অরুণ-আলো, প্রবেশিল, পঙ্কজ-পুটে
যতেক যাত্রি-লোক, মেলি চোক, জাগিয়া উঠে।
পুলকে নিমগন, যাত্রি-গণ, যারে নিরখি,
সাত্ত্বিকা নাম তার, মায়া-মার প্রধানা সখি ॥১২৪॥

সুধা বচনে ভাষি, বলে হাসি, মায়ার সখি ;
"কত দিনের পরে, কবিবরে, হেতা নিরখি!
এস মায়ের ঠাঁই, লয়ে্যা-যাই, জুড়াবে প্রাণ ;
তুমি এস্যেছ যবে, নব হবে, এ সব স্থান ॥১২৫॥

ফুল ফুট্যেছে গাছে, চেয়ে্যা-আছে, তোমার তরে।
ঐ শুন আগমনি-পিক-ধ্বনি নিকুঞ্জ-ঘরে॥"
সাগর গরজায়, শুনা যায়, কিঞ্চিৎ আগে ;
অচল দেখা যায়, ভীমকায়, নিকট-বাগে ॥১২৬॥

যেখানে জল-স্থল-মহাচল-শূন্য-পবন
করিয়া আছে সন্ধি, ফুল-গন্ধি বিরাজে বন।
সেই কানন-চ্ছায়ে মায়া-মায়ে হেরিল কবি ;
বিরাজে বনেশ্বরী আলো-করি, মায়া-অটবি ॥১২৭॥

হেরিলে যাঁর মুখ, ঘুচে দুখ, মরণ-ভয়,
কবি নিরখে যেই, সুখে সেই, মগন হয়।
তাঁর সে দুটি পদ-কোকনদ-সুধার আশে
লুটায় ভূমিতলে, অশ্রুজলে নয়ন ভাষে ॥১২৮॥

এমনি নিমগন, হল মন, সে রস-পানে,
কেবা কোথায়, কিবা নিশি-দিবা, কিছু না জানে।
স্বরগ করে ভোগ শোক রোগ, সকল ভুলি।
দেবতা যেন তারে ভবপারে, লইল তুলি ॥১২৯॥

জানুতে করি ভর, অতঃপর, (পীযূষ-পানে
হয়ো শীতল-শান্ত) চায় পান্থ মায়ের পানে।
বিতরি করচ্ছায়া, বলে মায়া, "আশিস লও,
সকল রোগ শোক দূর হোক, অমর হও ॥১৩০॥

কবি বলিল "দেবি, তোমা সেবি সব আমার!
করেছি পদ-লাভ, কি অভাব, আছয়ে আর?
সতত এই ঠাঁই, স্থান পাই, আগের মতো,
সেই আশিস মাগি, তারি লাগি শরণাগত ॥"১৩১॥

নয়ন-সরসিজ মুছি নিজ বারেক দুই
মনে ভাবিল দেবী "সেই কবি এখনো তুই।
করিতে হবে কত ঘোর ব্রত উদ্‌যাপন—
বাছা তা জানো নাই, না জানা-ই ভাল এখন ॥"১৩২॥

রাজসী নাম যার মায়া মার পাগ্‌লী সই
আপন মনে হাসে, কান্না আসে ক্ষণেক বই।
বলে তাহার পরে কবিবরে "আইস উঠি
কেন তা নাহি কব—দেখি তব নয়ন দুটি!' ১৩৩॥

এত বলি লইয়া অঞ্জন-শলা
কবির নয়নে মাখাইয়া-দিল কজ্জলের মলা।
সে যে ভাবাঞ্জন
নিখিল-রঞ্জন!
চমৎকার গুণ তার নাহি যায় বলা ॥১৩৪॥

প্রেমের আগুন, করিয়া দ্বিগুণ,
দূর-বাসী বন্ধু-জনে নেত্র-পথে আনিতে নিপুণ।
তৃষ্ণানাশ-কারী
মরীচিকা বারি
পিয়ায় প্রেমিক জনে, এই তার গুণ ॥১৩৫॥

ভাবাঞ্জনে অপূর্ব নয়ন লভি
সন্ধ্যাভ্র-গিরি-শিখরে কল্পনারে নিরখিল কবি।
ভূষিছে, বালিকা,
চারু অট্টালিকা ;
সঙ্গে সখী শরন্ময়ী সুরুচি মাধবী ॥১৩৬॥

দিব্য হর্ম্য-বাতায়ন,
তথায় তিন জন
প্রাণের পরিজন,
লইয়া কাছে ;
সমীরণ সুধা ঢালে,
কল্পনা হেন কালে,
হাতটি দিয়া গালে,
বসিয়া আছে।

মাধবী, শরন্মই,
সুরুচি তিন সই
জানে না সখী বই
কোন জনায়।
মাধবী শরতে মিলি,
হাসিছে খিলি খিলি,
সুরুচি নিরিবিলি
কেশ বিনায় ॥১৩৭॥

কুসুম কাননে যথা,
শোভয়ে পুষ্প-লতা,
লালিত্য চঞ্চলতা
মিলিত করি।
তাহা করি অতিক্রম,
সজনী-সমাগম
কি শোভে অনুপম,
আ-মরি-মরি !

ঈষৎ বহিলে বায়,
পুষ্প-লতা হোতায়,
হাসিয়া পড়ে গায়
সবে সবার।
হেতা বায়ু হাস্যালাপ,
অঙ্গ লতা-কলাপ,
স্তনের পরিমাপ
ফুলের ভার ॥১৩৮॥

বাতায়ন পেয়ে মুক্ত,
মলয় সুধা-সিক্ত,
সৌরভ সংযুক্ত
হিল্লোল হানে।
কল্পনা সুধীবে উঠি,
ধরি কপাট-দুটি,
আঁখির দিল ছুটি
বাহির পানে॥

হেরিল অমনি ধনী,
সুধার যেন খনি,
বিশদ নিশামনি,
কুমুদ-প্রাণ।
জ্যোৎস্না-আঁচল-ধার
খসি পড়িছে তার,
ফাঁকায় অন্ধকার
না পায় ত্রাণ ॥১৩৯॥

লতা-পাতা তাম্র-রুচি,
মালিন্য এবে ঘুচি
করিছে শুদ্ধ শুচি
রজত-ভান।
ফুল তাহে ধরিয়াছে,
লাবণ্যে ভরি আছে
বনেরে করিয়াছে
জীবন-দান!

হেতায় রম্য অটবি,
কোথায় হায় কবি,
জাগিছে তারি ছবি,
কল্পনা-প্রাণে।

নয়নে উদ্যান শোভে,
কোকিল শ্রুতি-লোভে,
হৃদয় কেন ক্ষোভে
হৃদয় জানে ॥১৪০॥

কোকিল ডাকিল কুহু,
কল্পনা করি উহু,
নিশ্বাস ফেলে মুহু,
পরান কাঁদে।
এ হেন রঙ্গ নিরখি,
তাহার দুই সখি,
করিয়া চোখোচখি,
কহিল ছাঁদে॥

"হেতা আয় শরম্মই,
কথা-বারতা কই ;
কেন লো প্রাণ-সই
উতলা অত?
ভাবিয়া হল যে সারা,
ঠেকে কেমন ধারা
ঠিক লো মণি-হারা
ফণির মত ॥"১৪১॥

সুরুচি অবাক্ মানি
হেরিল কানাকানি,
ভাবিল "কি না জানি
পাতিছে কল।"
বলিল "তোরা কি হলি!
যে দেখি গলাগলি,
কি এত বলাবলি,
আমার বল্॥"

শরৎ, মধুর-স্বরে,
কহিল হাস্য-ভরে,
"বলিতে মানা করে,
মাধবী মোরে।
বলি তোর কানে কানে,
আয়লো এইখানে,

দ্যাখ্ সখীর পানে
ঠাহর করো ॥১৪২॥

"সন্ধ্যা-থেকে অই ধারা,
উঠিল সব তারা,
নয়নে বহে ধারা,
কথা না ফুটে।

নদী যবে এক টানে,
বহে সাগর-পানে,
ঠেকিলে কোনখানে,
উথলি উঠে!"

সুরুচি এতেক শুনি,
মনে প্রমাদ গুণি,
চলিল রুন্-রুনি,
সখীর পাশে।

বলিল ক্ষণেক-বই,
"ভাবিছ কেন সই?
ভাবিলে ক্রমশই
ভাবনা আসে ॥১৪৩॥

"শুখায়েছে মুখ-খানি,
একটি নাহি বাণী,
এলিয়ে গেছে বেশি,
বাঁধিয়ে-দেই।
যেতে কি হয় একেলা,
মো-সবে করি হেলা,
গেছ্ ভোরের বেলা,
আইলে এই!—

"বলিব কি প্রাণে বাজে!
ও কি তোমায় সাজে!
গিয়াছ ধরা-মাঝে!—
কাঁপে হৃদয়!
অমন কি যেতে আছে!
ওতে কি দেহ বাঁচে!

লৌহ-পাষাণ ছাঁচে
গড়া তো নয়!” ॥১৪৪॥

ভাবনায় নিমগন
হইয়া এতক্ষণ,
বিরহিণীর মন
ছিল কোথায়!
আচম্বিতে ভাবে ধনী,
এসেছে গুণমণি,
শিহরিয়া অমনি
ফিরিয়া চায়।

ভ্রম যবে গেল ঘুচি,
বলিল আঁখি মুছি,
“জ্বালাস্‌নে সুরুচি,
সর্‌ লো সর্‌!
একান্ত বধিবি যদি,
ফ্যাল্‌ আমায বধি,
মারিস্‌নে দগধি,
মিনতি ধর!” ১৪৫॥

এতেক দেখিছে কবি, ভাব-চক্ষে ;
হেনকালে মায়ার তামসী-সখী আইল সমক্ষে
অন্ধ তমো-রাশি
কোথা হৈতে আসি
স্বপ্ন-দেখা ঘুচাইল শেল হানি বক্ষে ॥১৪৬॥

দারুণ বিরহে, কবিবর দহে!
মরম ভেদিয়া বাহিরয় শ্বাস, যাতনা না সহে।
মনের হুতাশে,
বলিল “কোথা সে!”
বলিতে বলিতে, আর, চক্ষে ধারা বহে ॥১৪৭॥

“কোথা গেল আমার প্রাণের ছবি।
এ যে দেখি সরোবর!” কহে কবি জ্ঞান কিছু লভি।
সখ্য রসে দেখি,
বলি কবি “এ কি।”
সখ্য বলে “আশ্চর্য কিছুই নয় কবি! ১৪৮॥

"মায়া-রথে এস্যেছ মানস-ধারে,
বিলাস-পুরীতে চল মায়া-মার আজ্ঞা অনুসারে।"
কবি বলে "হায়!
ছিলাম কোথায়,
এলাম কোথায় আর মুহূর্ত-মাঝারে!" ১৪৯॥

সখ্য বলে "এ সব মায়ার খেলা!
দেবীর আদেশে কবি অই দেখ আসিয়াছে ভেলা।
অই দেখ দোলে,
সরসীর কোলে!
সঙ্গে মোর যাবে যদি এস এই বেলা ॥১৫০॥

"দেখিবে প্রমোদ-সনে করি সখ্য,
কাল-রূপ তুরঙ্গে চাবুক-দিতে কেমন সে দক্ষ।
চক্ষে দিয়া ধুলা,
যাবে দিন গুলা,
কোঁন্ দিক্ দিয়া গেল, হইবে না লক্ষ ॥"১৫১॥

সপ্তম সর্গ .

শান্তি-প্রয়াণ

রণাবসানে হত এবং আহতে সমাকীর্ণ রণক্ষেত্র দেখিয়া কবির বৈরাগ্য-উদয়। করুণার প্রসাদে সুসঙ্গ লাভ। শমদমের আশ্রমে গমন। পাশব বৃত্তি সকলের উচ্ছেদ। সাধুসম্মিলন এবং দেবসম্মিলন। শুভ পরিণয়। নিদ্রাভঙ্গ এবং স্বপ্নাবসান।

*

"জয় জয় পরব্রহ্ম
অপার তুমি অগম্য,
পরাৎপর তুমি সারাৎসার।
সত্যের আলোক তুমি
প্রেমের আকর-ভূমি
মঙ্গলের তুমি মূলাধার॥
নানারসযুত ভব
গভীর রচনা তব,
উচ্ছ্বসিত শোভায় শোভায়

মহাকবি আদিকবি
ছন্দে উঠে শশিরবি,
ছন্দে পুন অস্তাচলে যায়॥
তারকা কনক-ভাতি
জ্বলদ্‌-অক্ষর-পাঁতি,
গীত লেখা নীলাম্বর-পাতে।
ছয় ঋতু সম্বৎসরে
মহিমা কীর্তন করে,
সুখ-পূর্ণ চরাচর সাথে॥
কুসুমে তোমার কান্তি,
সলিলে তোমার শান্তি,
বজ্ররবে রুদ্র তুমি ভীম।
তব ভাব গূঢ় অতি
(কি জানিবে মূঢ়মতি)
ধ্যায় যুগযুগান্ত অসীম॥

আনন্দে সবে আনন্দে
তোমার চরণ বন্দে
কোটি সূর্য কোটি চন্দ্র তারা।
তোমারই এ রচনারই
ভাব লয়ে নরনারী
হা হা করে, নেত্রে বহে ধারা॥
মিলি সুর নর ঋভু
প্রণমি তোমায় বিভু,
তুমি সর্ব-মঙ্গল আলয়।
দেও জ্ঞান দেও প্রেম
দেও ভক্তি দেও ক্ষেম
দেও দেও ও পদ-আশ্রয়॥"

নিশি অবসানপ্রায়
সুখে সবে নিদ্রা যায়
শয্যা কেহ ছাড়িতে না চায়।
ঘা দিয়া হৃদয়-মাঝে
মঙ্গল আরতি বাজে—
পুণ্যগন্ধী সমীরে নাচায়॥

এ হেন সময়ে কবি
উঠিল চেতন লভি,
বাহিরিল বাহির-উদ্যানে।
নিঃশব্দ-তরঙ্গবতী
চলে গঙ্গা ভাগীরথী
ধীরে ধীরে সাগরের পানে॥

স্নিগ্ধ কিবা এই কাল,
নাহি কোনো গোলমাল,
নিস্তব্ধ ব্রহ্মাণ্ড সমুদয়।
ঝোপঝাপ অন্ধকার,
নভস্তল পরিষ্কার,
লতাপাতা হিমবিন্দুময়॥
শশী অস্ত যায়-যায়,
কি দুর্দশা হায় হায়,
কেবা তার দুরবস্থা দ্যাখে।
এমন যে বন্ধু, তারা,
স্বচ্ছন্দে এখন তারা
তারে ফেল্যে যায় অ্যাকে অ্যাকে॥
শাখাপত্র ঢুলাইয়া,
জলপুঞ্জ ফুলাইয়া
বুলাইয়া মাঠ-ময়দান।
মন্দ মন্দ বায়ু বহে,
কবি মনে মনে কহে
"আহা কি সুন্দর এই স্থান!"॥

(সংস্কৃত শিখরিণী ছন্দ)

।　　　।　　।　　　।
বৃক্ষগণ হেলিত সুশীতল সমীরণে।
।　　　।　　।　　　।
পুষ্প যত প্রস্ফুটিত পুষ্পময় কাননে
।　।　　　।　　।
মত্ত মধুপায়িদল ধাইল ত্বরা করি।
।　　　।　　।　　　।
জাগিল বিহঙ্গকুল ভাগিল বিভাবরী॥

গান :

১

পূরবী-মধ্যমান

বসন্তের কাল গেছে,
কেন ফুল ফুটিবে আর আর!
ভানু গেছে অস্তাচলে,
হবে নাকি অন্ধকার।
ছিল প্রাণ, সে গিয়াছে,
দেহে কি আর কেহ আছে ;
কাহারে কেমন আছ
সুধাইছ বারে বার।
ছিঁড়িয়া গিয়াছে তার
বীণা কি বাজিবে আর!
হাসিটি চলিয়া গেছে,
রেখে গেছে হাহাকার।

২

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ-কাওয়ালি

সে-জন বিহনে প্রাণ বাঁচে না, ওলো,
ভালোবেসে হল একি দায়!
না মানে প্রবোধ মন, এ আমার সইতে নারি,
যাতনা সইছে মুখশশী,
হৃদে সদা জাগে লো সে মুখশশী।
হৃদে করে অধীর প্রাণ, সে মধুর হাসি
প্রাণ সঁপেছি তারে—
সে কি তাও জানে না "প্রাণ", না,
এক পলক না-হেরিলে
জীবন রহে না সই॥

পূরবী—মধ্যমান

৩।০

। ০ । ১ । ২ ৺ ৩ ।

কথা :—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

|| {সা ঋা গা -ক্ষপা | -া -া -া পা | ক্ষপা -া -ক্ষপধা -না
ব স ন্তে ০ | ০ ০ ০ র | বা ০ ০০০ ল্

| ধপা -ক্ষপা পা -া | পা ক্ষা ক্ষপধা -পা | -ক্ষপা -পা গক্ষপা ক্ষা
গে ০০ ছে ০ | কে ন, ফু০০ ০ | ০০ ল্, ফু০০ টি

| ক্ষপাঃ -ঋাঃ -গা -া | (গঋা -া -সঋসন্া -সন্া)} | গঋা -া -সা -া ||
বে ০ ০ ০ | আ ০ ০০০০ র্০ | আ ০ ০ র্

[গপা]
| {পা পা পাঃ -ক্ষপঃ | -ধা -পা ধা ধা | ধর্সাঃ -নর্সঃ -র্সনা -র্সা
ভা সু গে ০০ | ০ ০ ছে, অ | ন্তা ০০ ০০০ ০

| নর্সনধা -নধা পা -ক্ষপা} | -পা -া পা ক্ষা | ক্ষধা -া পা ক্ষপা
চ০০০ ০০ লে ০০ | ০ ০ হ বে | না ০ কি, অ০

[গপা]
| ক্ষপাঃ -ঋাঃ -গা -া | গঋা -া সন্সাঃ ন্ঃ || {পা পা পাঃ -ক্ষপঃ
ক্ষ ০ ০ ০ | কা ০ ০০০ র্ || ছি ল, প্রা ০০
ছিঁ ড়ি য়া ০০

| -ধা -পা ধা ধা | ধর্সা -া -নর্সর্রর্সা -নর্সা | র্সা র্সা -া -া
০ ০ ণ, সে | পি ০ ০০০০ ০ | য়া ছে ০ ০
০ ০ গি য়া | ছে ০ ০০০০ ০ | তা ০ ০ র্

| নর্সা নর্সা ধা -া | পা ধা ধা -পধা | -না -া -ধনর্সা -া
সে হে,০ কি ০ | আর্, কে হ ০০ | ০ ০ ০০০ ০
বী ণা,০ কি ০ | বা জি বে ০০ | ০ ০ ০০০ ০

| নসনধা নধা পা -মপা } || গপা পা পা -া | -া -া পা পা
| আ০০০ ০০ ছে ০০ | কা হা রে ০ | ০ ০ কে ম
| আ০০০ ০০ ০ র০ | হা সি টি ০ | ০ ০ চ সি

| মপধা -া -া -া | গপা -মপা পা -া | -া -া পা মা
| ন০০ ০ ০ ০ | আ ০০ ছ ০ | ০ ০ সু খা
| য়া০০ ০ ০ ০ | গে ০০ ছে ০ | ০ ০ রে খে

| গধা -া পা মপা | গপা -ধা -পা -া | গধা -া -সধাসন্‌া -সন্‌া || ১৪১
| ই ০ ছ, যা০ | রে ০ ০ ০ | বা ০ ০০০০ র০ ||
| গে ০ ছে, হা০ | হা ০ ০ ০ | কা ০ ০০০০ র০ ||

১০

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—কাওয়ালি

।১
। ০ । ১ । ২´ । ৩ ।

কথা :—শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর

||{ পা গধা পা মা | পা গপা সা রা | মা পা মা -া | (পা মা পা -র্সর্ণর্সর্ণা)}|
| সে জ ন, বি | হ নে, প্রা ণ | বাঁ চে না ০ | (ও গো, স ই০০০)

| মা রা পা সা | রা রগমাঃ -গঃ রসা | গধ্‌সধ্‌া -া ধ্‌া -া | প্‌া ধ্‌া সা রা
| তা ন, বে সে | হ' ন০০ ০ একি | দা০০ ০ ০ য় | না যা নে, প্র

| পা পা সা রা | পা -পা -পা -পা | না না র্সা ননা | র্সা -নর্সর্রা র্সা ণধা
| বো ধ, ম ন | এ ০ ০ ০ | আ মা র সইতে | না ০০০ রি, যা০

| গধা মা -পা র্সর্ণর্সর্ণা || -া -া । । | পা পা পা পা | ধর্সর্ণাঃ -ধঃ পা পা
| ত না, স . ই০০ || ০ ০ | সে, সু খ, শ | শি০০ ০ হৃ দে

|{ ণা র্সা -া ণধা | -পা ধা র্সা -া |(র্রা র্রা র্রা র্রা | র্রর্মর্জ্ঞাঃ -র্রঃ র্সণা ধপধা)}|
 স দা ০ জা০ | ০ গে, লো০ | সে মু খ, শ | শি০০ ০ ছ০ দে০০

| -া ধা ণা র্সা | র্গা র্গা র্সা র্রা | র্রর্গা -র্মর্গর্মা র্গর্রা র্সা | ণর্সণা ধা না র্সা |
 ক রে, অ | ধী র, প্রা ণ | সে, য ০০০ ধু০ র | হা০০ সি প্রা ণ

|{ না নর্সর্রা -র্সা ণধা | পধা পমা -পা পমা | রগা -রগা মা পা | (রসা -া না সা)}|
 সঁ পে০০ ০ ছি০ | তা রে০ ০ সেকি | তা০ ও০ জা নে | না০ ০ "প্রা ণ"

| রসন্‌া -সা সা মা | পমা পা পণধা -পধা | না না র্সা -া | না নর্রা র্সা ণা |
 না০০ ০ এ ক | পল ক, না০০ ০০ | হে রি লে ০ | জী ব০ ন, য

| ধা পমা পা -র্সণর্সণা || ১৪২
 হে না,০ স -ই০০০

বত্রিশ হলবর্ণ

ব্যঞ্জন বরণ নহে চৌত্রিশের কম।
কারে রাখি, কারে ঠেলি, সমস্যা বিষম॥
এক ব-এ বস্ আছে—দুই ব কি জন্য?
জ্যান্ত-ন দন্ত্য-ন পেলে কে চাহে মূর্দ্ধণ্য?
ণত্ব ণ পড়িল সরি দেখি বেগতিক।
বরণমালার আর মাড়াবে না দিক॥
অন্তস্থ ব এর আর দেরি সহিল না।
পলাইল রাতারাতি—ঘুচিল যন্ত্রনা॥
এ-দুটা আছিল মোর দু-চক্ষের বিষ।
চৌত্রিশের দুই গেল, রহিল বত্রিশ॥
বর্গে বর্গে বসি গেল বর্ণ আট আট।
চারি আটে হয়ে গেল বত্রিশ ভরাট্॥

কচবর্গ—ক-চ খ-ছ গ-জ ঘ-ঝ—লভ।
তপবর্গ তেম্নি—ত-প থ-ফ দ-ব ধ-ভ॥
ন-ট ঙ-ঠ ম-ড ঞ-ঢ—নটদল পষ্ট।
র-স ল-ষ য-শ হ-ক্ষ, রস-বশ অষ্ট॥

শূন্যের শূন্যত্ব

শবদের অন্তে মাঝে বসে যবে সুখে,
বেরোয় য়-ড়-ঢ় বুলি য-ড-ঢ'র মুখে॥
জানো যদি, কেন তবে শূন্য দেও নিচে?
চেনা বামুণের গলে পৈতে কেন মিছে!
নিচের ছত্তর-চারি চেঁচাইয়া পড়—
যাবৎ না হয় তাহা কণ্ঠে সড়গড়॥

বঙ্গাক্ষর বর্ণমালা ॥

প্রথম খণ্ড ॥

প্রথম অধ্যায় ॥

বত্রিশ হলবর্ণ।

ব্যঞ্জন বরণ নহে চৌত্রিশের কম।
কা'রে রাখি, কারে ফেলি, সমস্যা বিষম ॥
এক বর্গ বসে আছে — দুই ব কি জন্য?
অন্তস্থ-ব ওষ্ঠ্য-ব পেলে কে চাহে দুবর্ণ?
ণত্ব ণ পড়িল মরি' দেখি' রকারিক।
বরণমালা'র আর মাড়া'লে না দিক্ ॥
অন্তস্থ য-র আর দেখা মিলিল না।
পালাইল রাতারাতি — খুঁজিল কেহ না ॥
এ-দুটো তাড়াল মোর দু-টাকার বিষ।
চৌত্রিশের দুই গেল, রহিল বত্রিশ ॥
বর্গে বর্গে বসি' গেল বর্ণ আট আট।
চারি আটে হ'য়ে গেল বত্রিশ ঠাট্ ॥

বাবুর্চি — ক-চ আ-ছু গ-জ ধ-ম — লাজ'।
আবর্জি তেমি — ত-প ম-ফ হ-ব ধ-ভ॥
ব-টি ও-টি ম-ড স্ত-ঢ — বচিদল পাচ্ছে।
দু-স ল-হ য-প হু-ঞা, রস-বশ আখড়া॥

দুঃখের দুষ্কৃত।

শরতের অভ্রে আলো বসে মরে সুখে,
সেলামের ম-ড়-ড় বুলি য-ড়-ড়'র মুখে।
জানো যদি, কেন তবে শূন্য দেও নীচে?
সোনা কাপুড়ের গলে সেজে কেন মিছে!
নীচের ছুতোর-চারি তৈলাইয়া পড়ে'—
সাধে না হয় তাহা কণ্ঠে সড়গড়'॥

পাঠ।

আষাঢ়েতে ঢাকিল নভ' পয়োধর-জালে,
রাজহংস উড়িয়া বসে ডালের আড়ালে॥
ঘনঘোরে ময়ূরের আনন্দ না ধরে।
খুলিয়া সডসজোড়া ঢুকিলাম ঘরে॥

পাঠ

আষাঢ়ে ঢাকিল নভ পযোধর-জালে।
বাযস উডিযা বসে ডালের আড়ালে॥
ঘনরবে ময়ূরের আনন্দ না ধরে।
খুলিয়া খডম জোড়া ঢুকিলাম ঘরে॥

প্রথম খন্ড। প্রথম অধ্যায় (১৩১৯)

একস্বর অক্ষরের পদাবলী

মধু ঋতু এল ধরণীমাঝে।
হেলে দোলে লতা মোহন সাজে॥
অমৃত বরিষে মৃদু সমীর।
পরাণ লভয়ে মৃত শরীর॥
ঝুরু ঝুরু ঝুরু বহিছে বায়।
ঝরিয়া পড়িছে বকুল তায়॥
মধুমালতীর ফুটিছে কলি—
চারিদিকে আর ঘুরিয়া অলি
গুন্‌গুনায়িছে নব রসিক।
পহরে পহরে কুহকে পিক॥
ফুলের কে পায় কূলকিনারা।
অগনন যেন গগনতারা॥
তরো তরো ফুল রঙবেরঙ।
শতেক ফুলের শতেক ঢঙ ॥
কেহবা দোলে কেহবা ঝোলে।
কেহবা গন্‌ধে মাতায়ে তোলে॥
কেহবা ছড়ায় সরণ রেণু
রাখাল যথায় বাজায় বেণু॥
রাশি রাশি ফুলে ভরিল সাজি।
ঘরে ফিরি চল আর না আজি॥

প্রথম খন্ড। পঞ্চম অধ্যায় (১৩১৯)

একস্বর অঙ্কের
পদাবলী।

মধু ঋতু এল ধরণী মাঝে।
হেলে দোলে লতা দোলন সাজে
অমৃত বরিষে মৃদু সমীর।
পরাণ লভয়ে মৃত শরীর॥
ঝুরু ঝুরু ঝুরু বহিছে বায়।
মাতিয়া পড়িছে বকুল তায়॥
মধুমালতীর ফুটিছে কলি —
কেবিলিয়া আর ধুনিছে অলি

গুন্ গুনানি দিয়ে নব বাসিক

লহরে লহরে দুহরে মিশে ॥

ফুলের কে খায় ফুল কিনারা।

অগণন যেন গগনতারা ॥

ওগো ওগো ফুল বউবেবউ।

শাকের [illegible] শাকের চিঠি ॥

কেহবা [illegible] কেহবা বোঝে।

কেহবা [illegible] তাহার ভেবে [illegible]

কেহবা [illegible] বাজাবে বেণু

বাতাসে বাতাসে বাজায় বেণু ॥

ন-ঙ-স-প্রধান যুক্তাক্ষরের পদাবলী

আনন্দের বৃন্দাবন আজি অন্ধকার।
গুঞ্জরে না ভৃঙ্গকুল কুঞ্জবনে আর॥
কদম্বের তলে যায় বংশী গড়াগড়ি।
উপুড় হইয়া ডিঙ্গা পঙ্কে আছে পড়ি॥
কালিন্দীর কূলে বসি কান্দে গোপনারী।
তরঙ্গিণী তরাইবে কে আর কাণ্ডারী॥
আর কি সে মনোচোর দেখা দিবে চক্ষে
সিন্ধিকাঠি থুয়ে গেছে বিন্ধাইয়া বক্ষে॥

ষ-প্রধান যুক্তাক্ষরের পদাবলী

কৃষ্ণ গেছে গোষ্ঠ ছাড়ি রাষ্ট্র পথে হাটে।
শুষ্ক মুখ রাধিকার দুখে বুক ফাটে॥
কৃষ্ণ বলি ভ্রষ্ট বেণী বক্ষে ধরি চাপি
ভূপৃষ্ঠে লুটায়ে পড়ে মর্ম্মদাহে তাপি॥
কষ্টে বলে অষ্টসখী শোয়াইয়া কোলে
চিন্তা করিও না রাই কৃষ্ণ এল বলে॥
এতবলি হা-হু করে বাষ্প আর মোছে।
সবারই সমান দশা কেবা কারে পোছে॥
দুষ্টবধে পূরে নাই কৃষ্ণের অভীষ্ট
অদৃষ্টে অবলাবধ আছে অবশিষ্ট॥

প্রথম খন্ড। সপ্তম অধ্যায় (১৩১৯)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

যৌতুক না কৌতুক :

কুমারসেন

কুমারসেন যবে বালক অতি,
জননী তার—রাজরানী—
স্বর্গে গেল চলি ; ধরণীপতি
শূন্য দেখে রাজ-ধানী॥
শুনিয়া, "মা আসিবে," থামে কুমার,
ভুলায় যবে তারে ধাত্রী।
হুতাশে কাঁদি-উঠে পুন-আবার,
ঘুমায় না সারারাত্রি॥
বৎসরেক ভূপে দহিল শোক,
নবমহিষী এল ঘরে।
"এই যে মা এসেছে" দেখায় লোক
কুমারের মনে না ধরে॥
নব-বধূর কোলে, বছর শেষে,
হেরে ভূপ নব-কুমার।
আমোদ-আহ্লাদ ধরে না দেশে,
ঘুমের তিষ্ঠনো ভার॥
কুমারের বয়স হইল ষোলো—
ভুলেও কভু একদিন
মা শব্দ মুখে নাই,—দেখিয়া হল
ভূপতির মন মলিন॥
অঙ্গার ছিল আগে মনের কালি—
ক্রোধের ধরিল আগুন ,
মহিষী দিল তাহা ফুঁ দিয়া জ্বালি—
জ্বলিয়া উঠিল দ্বিগুণ॥
মন্ত্রিল ভূপতি সচিব-সাথে
"কুমারে নাহি মোর কাজ।

কনিষ্ঠ সুত মোর রঙ্গনাথে
করিতে চাই যুবরাজ॥"
ভূপের দৃঢ় পণ সর্বনেশে—
টলায় সাধ্য নাহি কারো।
গলায় দৃঢ় ফাঁস যুবতী-বেশে
দৃঢ় আঁটিয়া যায় আরো॥
হইল যুবরাজ—রঙ্গনাথ ;
(কুমারের সকলই দোষ!)
যতেক লোকজন করিতে হাত
খুলিয়া দিল রাজ-কোষ॥
কুমারসেন গেল বিদায় হয়ে,
শুভ্র চিত ভয়-হীন।
সেই অবধি থাকে মাতুলালয়ে,
পড়াশুনায় কাটে দিন॥
কুমারের মাতুল, ভাগিনেটিরে,
নিরখে তনয়ের মতো।
স্বাধীন ভূপতি সে—অধীনে ফিরে
রঙ্গনাথ শত-শত॥

মৃগয়া প্রয়াণ

প্রত্যূষে কুমারসেন
মৃগয়ায় বেরোবেন
রথ-সাজ লাগি আজ লাগিয়াছে ধুম।
সারথির দলবল
করিতেছে কোলাহল,
দু-কোশ মাঝারে কারও চক্ষে নাহি ঘুম॥
কুমার আনন্দে ভাসে,
নয়নে না নিদ্রা আসে,
সঘনে ফিরায় পাশ, পোহায় না রাতি।
প্রহর বাজিল যেই
ভাবে "চারিবাজে এই,"
দুফুর বাজিতে শুনি দমি যায় ছাতি॥
ব্যথি যেন পর-সুখে—
বহু কষ্টে ঘড়ি-মুখে

ধীরে-ধীরে বাহিরিল—এক-দুই-তিন।
বলে যুবা মুষ্টিঘাতে
"ঘড়ি যাক অধঃপাতে,"
শয্যা হতে উঠি পড়ে—লম্ফে যথা মীন॥
বয়স্য-দলের ঘরে
প্রবেশি উল্লাসভরে
বলে "ওঠো-ওঠো জাগো, রাত্রি আর নাই।"
কারো বা নাসিকা ডাকে,
ঢোক গিলে থাকে-থাকে,
ঈষৎ নয়ন মেলি আবার যা তাই॥
কেহ বলে "রাত্রি ঢের"
বলিয়া ঘুমায় ফের,
কেহ বলে "সবে আগে একসঙ্গে যোঠো।"
কুমার বলিল "কি এ!
মরেছ না আছ জিয়ে—
শত-ডাকে সাড়া নাই! ওঠো-ওঠো-ওঠো!"
উঠি বসি ঢুলি-ঢুলি
বারকত হাই তুলি,
"চল-চল-চল" বলে সবারে সবাই।
নিশা যবে ম্লান-ভূষা,
নয়ন মেলিছে উষা,
বাহিরিল মৃগয়ায় যাত্রী যত ভাই॥

বিপদ

ধনুর্বান হাতে করি, রথ আরোহণে,
চলিল কুমারসেন মৃগ-অন্বেষণে।
সারথি চাবুক কসে মৃগে দিয়া আঁখি।
রোষে মাতে তুরঙ্গ বদন উর্ধ্বে ঝাঁকি॥
সারথির উপরে করিয়া ঘোর আড়ি,
দুই-পা আছাড়ি বেগে রথ ফেলে পাড়ি॥
ভাঙিচুরি গেল রথ তরু-গাত্রে লাগি।
পল-মাত্রে হরিণ ক্রোশেক যায় ভাগি॥
ঘোড়ায় লম্ফিয়া উঠি, ত্বরায় অমনি,
ধাইল কুমার যেন জ্বলন্ত অশনি॥

মৃগের পশ্চাতে করি নিদারুণ তাড়া,
দেখিতে না-দেখিতেই হল দলছাড়া॥
যত দ্রুতবেগে যুবা মৃগ-পাছু ধায়,
শতগুণ বেগে তার হরিণ পলায়॥
ভূতল পরশিমাত্র শূন্যে উড়ি চলে।
অণু হয়ে যায় তনু যেন মন্ত্রবলে॥
যায় কি না-যায় দেখা—ক্ষণেকের পরে—
আর যেন চলিছে না, ঠেকেছে অম্বরে॥
এই হয়ে যায় মৃগ দিগন্তে বিলীন—
এই পুন ভাবে যুবা "ওই রে হরিণ!"
মৃগ-তৃষ্ণা / মৃগ সে যে—শূন্যে দিল ঝাঁপ,
মাঠের মাঝারে থামি ছাড়ে যুবা হাঁপ॥
গ্রীবা থাবড়িয়া যত থামায় তুরঙ্গে—
ঝড় বহে নাশায়—ঝরনা বহে অঙ্গে॥
কত আশ্বাসিল, নামি, পৃষ্ঠ থাবড়িয়া—
অশ্ব তেয়াগিল প্রাণ শুইয়া পড়িয়া॥
শ্রম-ক্লম-তাপ-তৃষ্ণা পন্থী এই চারি
প্রবল আশার কাছে ঘেঁসিতে না পারি—
আশা-ভঙ্গে তা-সবার কে দেখে প্রতাপ!
অনলে কুমারসেন দিল যেন ঝাঁপ॥
মাথার উপরে রবি ফাটিতেছে রাগে ;
সুদূরে কানন-রেখা, সেইদিক বাগে
চলি-চলি মুখ-বর্ণ হয়ে ওঠে নীল,
হস্ত-পদে ক্রমশই ধরি আসে খিল॥
ললাট মুছিতে যবে দাঁড়াইল থামি,
নেত্র দেখে অন্ধকার গাত্র উঠে ঘামি ;
ক্ষণপরে প্রাণ যেন কি করিয়া উঠে ;
ভূতলে ঘুরিয়া পড়ে, জ্ঞান আর ছুটে॥

উদ্ধার

চেতন লভি যুবা মেলিল আঁখি,
দেখি হল চেতনহারা—
চারিদিকে অবলা পড়েছে ঝাঁকি—
ভূতলে গগনের তারা॥

একের চারুকর বিতরে বায়,
 একের কোলে রয় মাথা।
এলায়ে কুন্তল ঠেকিছে গায়,
 আঁখিতে আঁখি রহে গাঁথা॥
বসাইল কুমারে তরুণী-সবে
 ধরি তুলি সুধীরে অতি।
বলিল, "জল আনি," মধুর রবে
 "মুখে দেও একরতি।"
জিনিয়া বেণু-ধ্বনি কণ্ঠরব
 শুনি যুবার হল কি যে!
মৃগয়া করা তার ফুরাল সব—
 মৃগ বনিয়া-গেল নিজে!
ভাবে যুবা "হল এ কেমন ধারা!
 সরোবর! বিজন বন!"
সামনে দেখে আর—অবাক পারা—
 একো নারী একো রতন॥
একের কেশ-পাশ ভুজগ-পাশ
 এলি পড়ে অনবধানে।
আঁখি একের করে সরব-নাশ—
 অথচ কিছু নাহি জানে!
একের নিরখিলে বদন-পানে
 মনেরে সামলানো ভার—
বিম্ব-অধরে চৌম্ব-টানে
 নয়ন ফেরেনাকো আর॥
বলে যুবা—"এড়ায়ে শমন-পুরী
 স্বর্গে আইলাম নাকি!
এঁরা বা স্বর্গ হতে এলেন উড়ি
 সফল করিবারে আঁখি!"
বলিল নারী এক "পড়িয়াছিলে
 মাঠের মাঝ-খানটিতে।
সহচরী আমরা ক-জনা মিলে
 আসিতেছিনু জল নিতে॥
হেরিনু পড়ি আছ চেতন-হারা,
 ভয় হল পাছে কি ঘটে।
না দেখি আর কোনো কূল-কিনারা,
 আনিনু সরোবর-তটে॥

চক্ষে দেখেছিনু রক্ষে তাই—
পরান কাঁপে—মা গো—স্মরি!
ভগবান দিবেন চরণে ঠাঁই—
এলেম তাই বেলা করি॥
এত বলি বাড়ায়ে মৃণাল-ভুজ
জল তুলিল ; তারপর
চোখে-চোখে হল কি বুঝ সমুঝ
সখিজনের পরস্পর॥
চুপিচুপি কি তবে করিয়া ঘোঁট
ফিরিল কুমারের পানে।
কি যেন বলিবারে খুলিবে ঠোঁট—
ক্ষণেক পরাজয় মানে॥
বলে "কাননে হেতা কেহ গো নাই,
নিকটে আছে দেবালয়।
ঠাকুরের প্রসাদ মিলে সে ঠাঁই
গেলে ঠিক্ এই সময়॥"
বলিয়া দেবালয় দেখায়ে দিয়ে
কলসি উঠাইল কাঁকে।
ফিরিয়া চায় মুহু আধেক গিয়ে
ঈষৎ ঘোমটার ফাঁকে॥

কুমারী অনিন্দিতা

অনিন্দিতা বালার নাহি রে তুলা—
রাজত্ব করে আপনি।
সুজন কর্মচারী অনেকগুলা—
মন্ত্রী সবার শিরোমণি॥
লিখেছে মন্ত্রীবর "বয়স তব
এখন তো অল্প নয়।
উদিত হইয়াছে যৌবন-নব,
উচিত হয় পরিণয়॥
সকল প্রজা-মুখে একই বাণী—
দেশে চিরায়ু, কর ঘর!
বিদেশি নৃপে কভু সঁপিয়া পাণি
মাতা হয়ে হয়ো না পর॥

নিঁখুত—কুলে-শীলে, আচারে শুচি,
দেশের যত মানী-গুণী।
পতি বরিতে হয় যাহারে রুচি—
আপনি বরো দেখি-শুনি।
রাজ্যে কত আছে অধীন ভূপ—
কিছুতেই নহে ন্যূন।
ঠিকরি পড়ে তনু বিমল রূপ
তাহা ছাপিয়ে ওঠে গুণ॥
সুপাত্র জুটাইয়া বসাব আমি
স্বয়ম্বর-সভায়।
গলায় মালা দিয়া বরিও স্বামী
যারে তব পরান চায়॥"
উত্তর লিখিল অনিন্দিতা
"সুহৃদ নাই তোমা-সম।
নাহি মোর জননী নাহিকো পিতা,
তুমি কেবল আছ মম॥
স্বয়ম্বরা হব ভাবিতে গেলে
শেল বিঁধে আমার বক্ষে।
নিরাশ হবে যে যে রাজার ছেলে
দহিবে মোরে কিনা চক্ষে।
আমা-পানে তাদের যতো না আঁখি--
রাজ্যপানে শতগণ!
আলো দেখি পতঙ্গ, পড়িবে ঝাঁকি—
কপালে ঘটিবে আগুন॥
বলিতেছ মন্ত্রী কি করি আমি!
হই যদি স্বয়ম্বরা
অনাথিনীর বেশে বরিব স্বামী,
রানী বলি দিব না ধরা॥
রাজ্যময় তুমি রটিয়া দিও
আমার আছে এক সই।
আমার-বই কাহুকে জানে না প্রিয়,
আমি জানিনে তারে বই॥
ছিল রাজার মেয়ে—রাজ্য-পাতে
রূপ-কুল আছে সমান।
ভূমি কেবল গেছে শত্রু-হাতে,
রাখিতে চাই তার মান॥

সখী সে আগে হবে স্বয়ম্বরা,
আমি হব তাহার পর।
সখীর মালা-ফাঁসে যে দিবে ধরা
খোয়াইবে আমার কর॥
আপন সখী হয়ে আপনি আমি
সাধিব হেন মোর ব্রত।
আমার হবে যত আমার স্বামী
ধরণীর হবে না তত॥
সখী হয়ে হইব স্বয়ম্বরা ;
সপ্তাহ গেলে—তারপর
পুন হইব রানী—পড়িলে ধরা
কে কেমন খাঁটি নর।"
হেন লিপি, সচিব, অনেক ভাবি
করিলেন অনুমোদন।
হৃদি-মাঝারে দেওয়া রহিল চাবি
বলিতে থাকে যাহা মন—
"রাজবালার দেখি কঠিন পণ
বিবাহ না হবারই গতি!
রাজ্যলোভে যার টলে না মন
মিলিলে হয় হেন পতি!"

সংবাদ

রাজবালা অনিন্দিতা
কুসুম সুললিতা—
কিরণ নিরমিতা
দেবীর প্রায়—
লাবণ্যে পালঙ্ক ধুয়ে
ভাবিছে শুয়ে-শুয়ে
"সখীরা মোরে থুয়ে
গেল কোথায়!"
হেনকালে খুলি দ্বার
সজনী জন-চার
পশিলে ঘরে—আর
ধরিল বুলি—

এক কথা ফিরি-ফিরি!
"কি গড়ন! কি ছিরি!
কেমনে বুক চিরি
দেখাই খুলি॥
কি মুরতি মরি-মরি।
না জানি কত করি
এঁকেছে ধরি-ধরি
বসিয়ে বিধি।
সাধিতে বা দেব-লীলে
ধরায় ধরা দিলে
স্বরগে নাহি মিলে
তেমন নিধি॥"
বলে ধনি "দ্বার ঠেলি
যে-করি তোরা এলি—
দেখি তোদের কেলি
বাঁচিনে আর।
মেলি যেন দিব্য-চোক
হেরিলি ব্রহ্ম-লোক—
তা-বিনে নিরালোক
ত্রি-সংসার!
সারা কাজ করি হেলা
ও কি লো লীলে-খেলা!
চলিয়ে যায় বেলা
নাহি সে খোঁজ!
হয় পারিজাত ভুল—
না জানি কি সে ফুল!
কানের কর্ দুল
খোঁপায় গোঁজ্!"
সখী বলে "সখী-মাঝে
বলিছ কোন লাজে!
তামে কি হীরা সাজে
সোনারে ছাড়ি।
রাজ্য করে কোন্ দেশে
ছাপা না রবে শেষে,
অতিথি হয়েছে সে,
ঠাকুর-বাড়ি॥"

ধাত্রীরে আড়ালে ডেকে
বলিল ধনি "দেখে—
আয় তো—উজ্জ্বলে কে
দিব-সদন।"
আধো কেঁদে আধো হেসে
বলিল বুড়ি এসে
"এমনও সর্বনেশে
করেছ পণ!—
সুপাত্তর গুণময়
যেমন হতে হয়!
এক যা করি ভয়—
—বলিতে নেই—
সৃষ্টি-ছাড়া পণ শুনি
পিছোয় যদি গুণী
কাড়িবে যে তরুণী
জিতিবে সেই,—
স্বর্গে যাবে সশরীরে,
ভাসিবে সুখ-নীরে,
চাবে না আর ফিরে
এ-বাগে পুন।
দুয়ারে সঁপিল বিধি—
ছেড় না—হেননিধি ;
বলিনু সাদাসিধি
বচন শুন॥"
শুনি ধনি হল ব্যস্ত—
পাছে এড়ায় হস্ত,
বলে "সূরয অস্ত
দে না রে দেখা!
দেবালয়ে সন্ধ্যাকালে
পূজিব মহাকালে
জানিনে এ কপালে
কি আছে লেখা!"

প্রিয়-দর্শন

দেবালয়ে ক্ষুধার আহার হল
ক্রমশ নেমে পো'লো বেলা।
আরতির সময় ঘুনায়ে এল,
লোকজন জমিল ম্যালা।
বাজি উঠে কাঁসর-ঘণ্টা-শাঁখ,
জ্বলি উঠে প্রদীপ-মালা।
সরিয়া দাঁড়াইল লোকের ঝাঁক—
আসিতেছেন রাজ-বালা॥
পতি-মিলন-তরে নৃপতি-বালা
মনে-মনে মানত মেনে,
ঠাকুরে প্রণমিয়া—যাবার বেলা
নিরখিল কুমারসেনে॥
ক্ষণেক দুই ধরি রহিল বালা—
কোন্ যেন কি এক স্বর্গে।
চমক ভাঙি যেতে বাড়িল জ্বালা—
বেড়িল অনুচরবর্গে॥
সখীরা ডাকি, বলে ভৃত্য-জনে
"শিব-চতুর্দশী আজ ;
ব্রত পালিবে রাণী শিবের বনে,
তোমা-সবার কর কাজ॥
যেথা পরান চায় এখন যাও ;
পোহাইবে যখন রাত,
ঘরে যাবেন রানী—যাইতে চাও
তখন তাঁহার সাথে সাথ।"
মন্দির পেরোতেই শিবের বন—
ঘেঁসিয়া সরোবর-কূল।
শিব-পূজার তরে সজনীগণ
তুলিতে আরম্ভিলা ফুল।

হৃন্মাল্য বদল

চতুর্দশী নিশি অন্ধকার!
বহিছে কি সরস বায়!
বনের ঘুচাইয়া মনের ভার
মধু-ঋতু মধুর ভায়॥
আড়ালে-আবডালে কানন-ফুল
আনন হেঁট করি রয়।
আঁধারে করি তারে প্রেয়সী-ভুল
চুম্বিতে যায় মলয়॥
খুঁজিয়া পায় যদি আপন ভুল—
খুঁজি না পায় কারে চায়।
কোকিল তাহা দেখি কূজি আকুল—
দশা দেখিলে দশা পায়॥
অনিন্দিতা বালা পশিল বনে—
মন রহিয়া-গেল পিছু।
পূজার আয়োজন সজনী-সনে
ভালো না লাগে তার কিছু॥
স্বর্গ হতে যেন পাতালে আসি
চলে বালা আঁধারে আঁধা।
তরণী মাঝ-গাঙে চলে রে ভাসি—
কূলে কঠিন ডোরে বাঁধা॥
হু-হু-হু-হু বহিল মলয়-বায়
দুলায়ে ডাল-পালা-ফুল।
কুহু-কুহু করিল কোকিল তায়—
সেই হল বোগের মূল॥
ভাবে ধনি চাহেনি আমার পানে—
ঠাকুরে ছিল তনময়।
থামের পাশ-বাগে ছিল যেখানে—
সেই আমার দেবালয়॥
চৌদিক করিল রাতি প্রভাত—
রবিটির যেন প্রতিমা!
স্বর্গ এত কাছে—না পাই হাত!
দুখের নাহি মোর সীমা!”
বসিল, হেন ভাবি, নৃপতি-বালা—
পরান নাই যেন ধড়ে।

বলিতে নাহি পারে মনের জ্বালা
আরো তাই বিপদে পড়ে॥
আকাশপানে চায় জুড়িয়া পাণি—
দেবতা যদি দেয় কূল।
সখীর পানে চায় কাতর প্রাণী
হৃদয়ে বিঁধে আর শূল॥
বলাবলি করিছে দু-জন সখী
"কে লো করিছে পায়চারি!
ওই যে লো হোতায়—দ্যাখ্ নিরখি—
কাননের নহে তো মালি!
এইদিক-বাগে যে আসে লো সই!
ওমা কি হবে! এ যে সেই!
দেখিয়া রাজ-বালা, একটু-বই,
লজ্জায় যেন আর নেই!
সজনী একজন বলিল তবে—
রূপসীরে আড়াল করি
"এদিকে এসো না গো! আমরা সবে
রাজ-বাটীর সহচরী!"
কুমার বলে তায় "ক্ষম এ জনে—
এসে পড়েছি নাই চারা ;
সৌরভের টানে পশিনু বনে
হইনু আর পথ-হারা॥
এনু যে পথ দিয়া—যে গোলমেলে!
ডালপালায় ঢলাঢলি!
কোন্‌টি সোজা পথ জানিতে পেলে
এখনই যাই আমি চলি॥"
রাজ-বালা অমনি আর
বলে "যে অন্ধকার!"
আর যা ছিল বলিবার
—না সরে বাণী॥
সখীরে লয়ে সখী যত
হইল বিব্রত ;
যুবা রহে বোবার মতো—
অবাক মানি!
দিগ্‌বিদিক্ না নিরখি
দু-আঁখি গেল বখি!

বলে যুবা "এমন সখী
তোমা সবার।
তোমাদের মতো ধন্য
আছে কেবা অন্য!
বাণী মোর অবসন্ন—
কি কব আর!"
বলে সখী "বিদেশি এসেছ হেতা—
কিছু জান না ভালো-মন্দ।
এ-হেন রাত্রিকালে বুঝিবে কে তা
কত-মত করিবে সন্দ॥
কে তুমি তাহা মোরা জানিতে পেলে
নির্ভাবনা হয় হিয়া।
কী নাম কোথা ধাম কাহার ছেলে,
এলে বা কিসের লাগিয়া॥"
অনিন্দিতার হৃদয়-চোর
বলে "সুরাজে মোর ধাম,
নৃপতি সুরসেন জনক মোর,
কুমারসেন মোর নাম॥
বেরোলেম হরিণ বধিব বলে—
লইয়া বহু পারিষদ।
বিধি সদয় মোরে—তাহা না হলে
আমিই হয়েছিনু বধ॥
মাঠের মাঝে মোরে দেখে তো ছিলে-
গিয়েছিল আমার প্রাণ—
ফিরালে তারে শুধু তোমরা মিলে
কি দিব তার প্রতিদান॥"
বলে সখী "ঘরের সকল-জনে
ভাবনায়-চিন্তায় বধি,
ফিরিছ মাঠে-মাঠে কাননে-বনে
সেই গো সকাল অবধি,—
হইয়া থাক যদি কোথাও ঋণী—
ঋণী তুমি তাঁদেরই কাছে।
বাঁচালেন—সবারে বাঁচান যিনি,
মোদের সাধ্য কি আছে॥
করিতে পারিয়াছি তোমায় খাড়া
মুখে দিয়েজলের ছিটে—

কী আর দিবে তুমি ইহার বাড়া,
সুধা-চেয়ে কী আর মিঠে।
আছে দিবার মতো একটি দান—
শুন যদি হইয়া স্থির—
স্বয়ম্বর-সভায় অধিষ্ঠান
মোদের এই সখীটির॥
তোমা-নামে তোমার মাতুল-ধামে
পত্র গিয়াছে তা জানি।
পিছাও পাছে তুমি সখীর নামে—
বলিতে বাধে তাই বাণী॥
জনক ছিল এর বৃহৎ ভূপ—
শত্রু কাড়ি নিল রাজ্য।
যখন হন বিধি যারে বিরূপ—
লিখন তাঁর অনিবার্য॥
এখন অনাথিনী—যা করে রানী!
কেহ নাই ত্রি-সংসারে!
যেমন ঘরে জন্ম—সঁপিবে পাণি
তেমনি রাজ-পরিবারে॥
এ সখী আশু হবে স্বয়ম্বরা,
তবে মোদের রাজ-বালা।
সখীর মালা-ফাঁসে যে দিবে ধরা
খোওয়াইবে রানীর মালা॥
সরোবরের ওই দেখিছ ঘাট
ওই ঠাঁই বসিবে চল।
বসিল যবে যুবা—এগোলো পাঠ,
বলে সখী "এখন বল—
চাও কাহার মালা—রাজবালার—
না সখীর—বলিও ঠিক!"
"উদিত দিবাকরে" বলে কুমার
"ঠাহর হয় না কি দিক্
নয়নে নিরখিলে যে পাই রাজ্য—
সসাগরা ধরণী ছার!
ঘটিলে বন্ধন অপরিহার্য
তবে তো কথা নাই আর—
অমরপতি-পদ কে কত চায়—
পথে ছড়াই রাশি-রাশি!

দেখিয়াও চিনিতে পার না—হায়—
কী ধনের কে প্রত্যাশী!
সুবাতাসে পাইল্ তুলি
তরী চলিছে ফুলি
আর কি হয় তটে উলি
টানিতে গুণ।
মন মোর এগিয়ে আছে—
যাব না তার পাছে!
জিজ্ঞাসা আমার কাছে
ঠেকে নতুন॥"
বলে তবে সজনীগণ
"হরি" সখীর মন
পার পাবেন কোনোজন,
—তার জো নাই।
সখীমণি হৃদয়চোরে
বাঁধিবে ফুল-ডোবে,
দেখিব নয়ন ভরে
মোরা সবাই॥"

পুরস্কার

সচিবের আহ্বানে অধীনস্থ নৃপসুত যত
একে-একে উদিল সভায় আসি।
রঙ্গনাথ আইল যখন—মন্ত্রী হইয়া বিব্রত
বসাইল আদরে কুশল ভাষি॥
পুরিয়া উঠিল সভা বরিষার তটিনী যেমন,
রবিচ্ছবি খেলায়ে রতন-মণি।
মন্ত্রীবর উঠিল, নিস্তব্ধ হল বিশাল সদন,
আরম্ভিল সুধীর গভীর ধ্বনি॥
"দেশের যতেক বাহু, নৃপগণ, স্কন্ধ আর আমি
বৃথা এবে—মস্তক বিহনে তার।
মস্তক তুলিবে দেশ এইবার—বরিবেন স্বামী
নৃপবালা, বিলম্ব নাহিকো আর॥
কিন্তু শুন তাঁর পণ, পেয়ে এক প্রাণের সজনী
পেয়েছেন কি যেন অমূল্য মণি।

রাজকন্যা ছিল সে, বংশের আদি ভাস্কর আপনি ;
যেমন সে রতন তেমনি খনি॥
পিতার ঐশ্বর্য তার সব যবে গেল শত্রুহাতে—
অকূলে ভাসিতে ছিল অনাথিনী।
নৃপ-বালা হইয়া আশ্রয়-তরী, আপনাতে তাতে
ভেদ নাহি দেখেন তিলার্ধ তিনি॥
বিচিত্র নারীর মন! দেখি নাই হেন সখি-স্নেহ—
করিছেন রাজবালা অনুমতি
কাহুকে না করিবেন পাণি দান—হউন যে কেহ,
সখী সে না যাবৎ বরিবে পতি!
এই সভা-মাঝারে সখী সে আজ হবে স্বয়ম্বরা
থাক দণ্ড দুয়েক সহিয়া ক্লেশ।
কর্তব্য, নৃপ-সবার, যথোচিত আনুকূল্য করা—
নির্বিঘ্নে যাহাতে হয় কার্য শেষ।
আর্যোচিত কার্য এটি তাহে আর নাহিকো সন্দেহ ;
বড়ো রাজ-ঘরের বিপন্ন মেয়ে
উদ্ধারিতে এগোবে আপনা-হতে বড়ো রাজা কেহ,
কিবা আছে আনন্দ ইহার চেয়ে॥
তাপ-ক্ষীণা হয় যবে উচ্চভবা গিরিজা সরিৎ,
উদ্ধারিতে তাহারে বরষা নামে!
উচ্চ-বাসী জলধর নিম্নে আসি সবজ্র-তড়িৎ
ফুলাইয়া তুলি তারে তবে থামে॥"
বসিলেন মন্ত্রীবর ; চুপচাপ-বিশাল-শালায়—
সবে চায় সবার বদন-পানে।
ইচ্ছা নয় কাহারো বঞ্চিত হয় রানীর মালায়—
প্রকাশিতে বাসনা পরাস্ত মানে॥
মন্ত্রীবরে সম্ভোধিল উঠিয়া যখন রঙ্গনাথ—
স্তম্ভিত হইল সবে কুতূহলে।
শুনি শেষে অযোগ্য গরব-বাণী ব্যথিয়া নির্ঘাত
কেহ হাসে কেহ জ্বলে রোষানলে॥
বলিল রঙ্গনাথ "মন্ত্রী তুমি
লোকের মর্যাদা জানো।
আমারই এ রাজ্যের অর্ধ ভূমি
ইহা অবশ্যই মানো॥
দশশো পদাতিক অশ্ব-রথ
সঙ্গে আসিয়াছে মোর।

রজত বরষিনু সারাটি পথ
কিছু না হবে দশ ক্রোর॥
হাসিছেন যাঁহারা—না হন গণ্য
আমার একগাছি চুল।
কাঁদিতে হত এই হাসির জন্য
হতেন যদি সমতুল॥
মালা দিবেনই আজ আমার গলে
যিনিই হোন স্বয়ম্বরা।
ধরা পড়িতে, আগে, ব্যাঘ্র-কলে
জাত-বাঘেই পড়ে ধরা॥
মালা দিতেন মোরে নৃপতি-বালা—
দিবেন নয় তিনি ফাঁসি!
তা বলি মোর গলে দিবে কি মালা
তাঁহার একজন দাসী!
তা, সে হবে না মোর থাকিতে প্রাণ!"
এত বলি বসিল রঙ্গ।
বলিল নৃপ এক "রোষের ভান
বীরত্বেরই বটে অঙ্গ।
মনে জানেন, রানী করুণাময়ী,
রসনা তাই দুর্দাম।
রানীর আজ্ঞা পেলে—দিগ্বিজয়ী
কেমন তাহা দেখিতাম!
বাহুবলের হলে পরীক্ষণ
মুখ-বল ঘুচিয়া যেত।
পদের মর্যাদা বিলক্ষণ
পলায়নে প্রকাশ পেত॥
আপনারে আপনি জানেন বাঘ—
চিহ্ন দেখি না তো কিছু।
বাঘের নিরখিলে নখের দাগ
ফেউ লাগেন তার পিছু॥
অমনধারা বাঘ অনেক জানি—
গর্জনে না পাই ভয়।"
পাশের নৃপ তারে বসায়ে টানি
বলিল "এ সময় নয়॥"
রঙ্গের পরম বন্ধু, নৃপ এক, এই অবসরে
দাঁড়াইল উঠি সভা-মাঝখানে!

সুধা বা গরল ক্ষরে রসনায়—দেখিবার তরে
মুখাইয়া রহে সভা মুখ-পানে॥
বলিল সে "মন্ত্রীবর! একা বহ অযুতের ভার,
স্কন্ধ তুমি দেশের অযথা নহে।
উচ্চশির নিচে নামি নতশিরে যে করে উদ্ধার
মহাত্মা সে—কে তার অন্যথা কহে॥
প্রাণ দিতে পারা যায় বিপন্নের হলে প্রয়োজন,
ক্ষত্রিয়েরই কাজ তাহা শাস্ত্রে লেখে ,
মান কিন্তু প্রাণ-চেয়ে কত বড় গৌরবের ধন,
এ সভা না যদি জানে—জানিবে কে?
সমানে সমানে হলে বন্ধন, অমরে করে গান ;
বিষমে বিষমে হলে বিষ ফলে,—
নীচকুল বৃদ্ধি পেয়ে বৃদ্ধি করে নীচত্বের মান,
উচ্চকুল চলি যায় রসাতলে॥
মন্ত্রী তুমি বলিতেছ—সবাকার তুমি অগ্রগণ্য—
তোমা-বাক্য সমূলে হেলিতে নারি।
আছেন কুমারসেন—বলি তাঁর মঙ্গলেরই জন্য—
তিনি হোন এ বিপদে কাণ্ডারী॥
হারালেন সিংহাসন—পড়ি শুধু জনকের রোষে
তা নহিলে আজিকে হতেন ভূপ।
রাজ-নন্দিনীর সখী ভাগ্য-দোষে—তিনি নিজদোষে,
লভিলেন পতন সমান-রূপ॥
এমন যখন মিল দু-জনায়—বিবাহ-বন্ধনে
বাঁধা দিতে তাঁহার আপত্তি কিবা।
মানায় আঁধার রাতি কলঙ্কিত শশাঙ্কের সনে—
রবি-সনে যেমন বিমল দিবা॥
সুযোগ্য কুমারসেন বিরাজুন স্বয়ম্বরা-শালে,
আমা-সবাকারে দেও অব্যাহতি।"
এত বলি বসিল ; কুমারসেন আছিল আড়ালে,
উঠি বলি প্রেমের নবীন ব্রতী॥
"করিলাম শিরোধার্য—আমি হব একাকী সভাস্থ!"
"তবেই হয়েছে!" বলে রঙ্গনাথ
"মাতুলান্ন ঘুচিল বা!" কেহ বলে "শরীরের স্বাস্থ্য
আছে তো—হইয়া যাবে দিন-পাত॥"
কেহ বলে সবাই আমরা দাস নৃপতি-বালার,
দাসী-পতি হবেন না হয় উনি!

কেহ বলে "যৌতুক মিলিবে রাজ্য—শুন হে কুমার,
পিছায়ো না কাহারো বচন শুনি॥"
থামাইয়া সবাকারে বলে মন্ত্রী "শুন নৃপ-সবে,
দণ্ডেকের কেবল বিলম্ব আছে—
এই সভাস্থলে সেই সখী আসি স্বয়ম্বরা হবে,
বিধান ইহার তোমাদের কাছে॥
অধিষ্ঠান কর যদি সভায় পরম ভাগ্য গণি,
নিতান্ত না কর যদি নিরুপায়!"
"চল-চল আর কেন!" সভাময় জাগি ওঠে ধ্বনি,
বিদায় মাগিয়া সবে গৃহে যায়॥
মনোরথে চড়িয়া কুমারসেন মনের উল্লাসে
মনোনেত্রে নিরখিছে স্বয়ম্বরা।
মন্ত্রী বলে "চিরবাঁধা রবে রাজ্য তব ঋণপাশে,
ঔদার্যে কিনেছ আজ বসুন্ধরা॥
বলিল কুমারসেন "আশ্চর্য! ঘটিল দেখি কাজে
স্বপনে ভাবি নাই কভু যাহা!
সাজিত এ সাধুবাদ শত-যোগ্য রাজ-অধিরাজে,
ব্যর্থ হল অপাত্রে পড়িয়া তাহা।"
মন্ত্রী বলে "তোমার মনের গুণে দেখিচ আশ্চর্য—
এতসব ভূপতি লোভের বশ!
আশ্চর্য ইহারে বলি—চলিলে না যে-দিকে ঐশ্বর্য—
করিলে কর্তব্য—পেলে অপযশ।"
হেনকালে ধূপ-ধুনা উথলি ব্যাপিল সভাময়
বাজিয়া উঠিল শঙ্খ-তূরী-ভেরি।
কুমারের তৃষ্ণার্ত নয়নে হল চাঁদের উদয
প্রেয়সীর সলজ্জ বদন হেরি॥
নয়নে নয়নে মিলি হৃদে হৃদে গেল জোড়া লাগি।
—দুজনার কার প্রাণ কার ধড়ে।
কম্পিত-করের মালা দুই বক্ষে করে ভাগাভাগি—
চক্ষে বাধি কুমারের কণ্ঠে পড়ে॥
রাজা হবে কুমার সপ্তাহ পরে—কিন্তু জনপ্রাণী
জানিল না সে কথা সখীবা ভিন্ন।
আর জানে মন্ত্রী আর পুরোহিত—চলে রাজধানী—
ভূপতি কে কোথায় নাহিকো চিহ্ন॥

শাস্তি

আলয়ে নাহি গেল রঙ্গনাথ,
রাজধানীতে করে বাস।
রানীর পরিষদে করিবে হাত—
মনের এই অভিলাষ॥
প্রাণের সখা-সনে বিরলে বসি
বলিল "বৌঠাকুরানী
কোন্ আকাশ থেকে পড়িল খসি
দাদার কণ্ঠে না জানি"॥
সখা বলে কুড়ায়ে পাওয়া জিনিস
মাটি থেকেই মাথা তোলে।
দাসীই হবে—তবে উনিশ-বিশ,
শর্মা কি ভড়ঙে ভোলে!
আপদ গেছে—এবে তোমার পালা,—
রাজা হও চক্ষু বুজে।
এবার আপনি নৃপতি-বালা
মালা দিবে মৃণাল-ভুজে॥"
রঙ্গ বলে "তা বুঝিনু যেন—
বিশ্বাস কি ফুল-অস্ত্রে!
শর্মা বলে "তবে অধীনে কেন
পুষিতেছ অন্ন-বস্ত্রে!
তোমায় যদি রানী না দিতে পারি
পৈতা ফেলি দিব জলে!
রূপা যখন তব আজ্ঞাকারী—
ব্রহ্মাণ্ড পদতলে!
রাজবাড়ির এক এসেছে নারী,
তাহার ভরা চাই মুঠা।
বেশি নয়—গয়না ভরি দু-চারি—
লাখশ বাণী আর ঝুটা॥"
"ডাকিয়া আনো তারে" বলিল রঙ্গ
সখা অমনি প্রস্তুত।
চকিতে ডাকি আনে—যেন অনঙ্গ
আপনি হইলেন দূত॥
নারী বলে "তরাসে কাঁপিছে অঙ্গ
হিয়া করিছে দুরু-দুরু।"

সখা বলে "এগোও—দিও না ভঙ্গ
সমর না হতেই শুরু॥
ওই মোদের ভূপ! ভূত না—ভূপ!
রাজা যাহারে বলে লোকে!"
বলিল নারী তায় "রাজা কিরূপ
দেখি তো নাই কভু চোকে॥
রাজবাটিতে আছি বছর-তিন—
রাজ-বালাই জানি রাজা।
কাজ করিয়া তাঁর রাত্রিদিন
ভাঙিয়া পড়িয়াছে মাজা॥"
বলিল তা শুনি ধূর্তরাজ
"চাকরি কি শক্ত সাজা!
ঘটকালিতে চট্ গুছাবে কাজ—
দু-দিনে তনু হবে তাজা॥
চাকরির কাঁটা বিঁধিছে বক্ষে
তাতেই পা পড়ে না ভুঁয়ে!
ভূপে করিলে হাত আছে কি রক্ষে—
পৃথিবী উড়াইবে ফুঁয়ে॥"
পথের মাঝখানে বলিল নারী
"বলিব নিরালায় চল।
তুমি যা বলিতেছ তা আমি পারি,—
কী দিবে আগে তাহা বল॥
আমায় দেখে ধনি প্রাণের মতো
যাহা বলি তাহাই শোনে।
পনেরো পার হল আর সে কত
রহিবে আইবুড়ো কনে॥
রাজকুমারী সে গো একেশ্বরী—
নূতন সব রীত-নীত।
আপনি দেখি-শুনি পছন্দ করি
করবে বর মনোনীত॥
চোখের দেখা আমি ঘটাতে পারি
শিবের বন-মাঝে কাল।
মনে ধরে না ধরে ডরাই ভাবি—
শেষে আমায় দেবে গাল॥
গড়ন ঢিলা-ঢালা বরন কালো,
চোক-দুটি কোটরে সাঁদা।"

শর্মা বলে "তিনি রূপসী ভালো—
নাক অবশ্য খ্যাঁদা?"
"বালাই! খ্যাঁদা কেন হইবে নাক!"
বলে তায় চতুরা নারী,
"তুমি গো সারা দেশে বাজাবে ঢাক-
বলি করিনু ঝকমারি!"
শর্মা বাজাইল গাঁটের টাকা—
নারী বলিল "ঠোঁট পুরু।
কথা থাকে না পেটে চুবড়ি-ঢাকা—
বলিতে করি যদি শুরু!"
শর্মা বলে "হায়! পেট তো অই!
চারি আঙুল বড়ো জোর!
ওতে থাকিবে কথা জায়গা কই!
সুডৌল দেখিয়াছ মোর,—
মণ্ডা চাপা দিলে পেটের কথা
পেটে থাকে দিব্য ভালো—
কোন আর থাকে না আধি-ব্যথা!
ঠোঁট বলিছ মাংসালো,—
ঠোঁটের দাম হত লক্ষ টাকা—
কাটা যদি থাকিত আগা ;
দশন থাকিত না বসন-ঢাকা—
সোনায় হইত সোহাগা!"
রমণী বলে "ছি-ছি রাজার মেয়ে—
ও কথা কি বলিতে আছে!
কেন পাড়িনু আমি কপাল খেয়ে
তাঁর কথা তোমার কাছে!"
শর্মা বলে "মোট কথাটা এই—
রাজবালার নাই তুলা!"
রমণী বলিল "তা নেই তো নেই—
পা-দুখানি বেজায় ফুলা।"
শর্মা বলে তিনি রাজকুমারী—
দুষ্টে দলিবেন পদে—
তাঁহার পায়া যদি না হবে ভারী
মানিবে কেন সভাসদে॥"
এত বলি রঙ্গের সামনে আনি—
নারীরে কবাইল সত্য।

সায়াহ্নে শিব-বনে আসিবে রানী,
বাধিবে আর প্রজাপত্য॥
মনে কি ভাবি রঙ্গ—ক্ষণেক বই
হইয়া ভাবে ঢলো-ঢলো
বলিল "তাঁর সই আমার সই—
কি চাও আমায় বল॥
যাবৎ—রবি-শশী তাবৎ-ঋণে
বাঁধা রব! তার নমুনা—
মুকুতা-মালাধর ; মিলনদিনে
পাবে ইহার দশগুণা॥
পত্র একখানি দিব কি সাথে?"
বলিল নারী "কাল যবে
যাবে শিবের বনে,—আপন হাতে
পত্র দিও—কাজ হবে॥"
পণ্ডিতবরে দিয়া রঙ্গনাথ
রচাইয়া পত্রখানি,
মুখস্থ করে বসি সারাটি রাত
কালো-রূপের বাখানি॥
পণ্ডিতে ডাকায়ে রঙ্গ কহে
"কি লিখেছ জানেন ধর্ম—
মর্ম বোঝা মোর কর্ম নহে—
বাহির হয় শুধু ঘর্ম!"
পণ্ডিত বলিল "আছে তো জানা—
চার-চক্ষু নৃপকুল ;
তবে যে তাঁরা হন শাস্ত্র-কানা—
কাল-মাহাত্ম্যই মূল॥
রাজকোষের আছে অমর-কোষ
কলিতে কলিকা না পায়।
ভাঁড়ারে অর্থ যার—অর্থদোষ
বাধে না তার রসনায়॥
অর্থ দিবে তুমি—শব্দ লবে,
এই তো ভালো মহারাজ!
গোপিনী মোলো শুধু বেণুর রবে—
শব্দ করে বড় কাজ!
শব্দ সামলাক—তবে তো অর্থ!
না যদি হয় ধনি কালা

যে বাণ ছাড়িয়াছি তা অব্যর্থ!
তোমারই হবে রাজবালা!”
“এই লও” বলিল রঙ্গনাথ
“বিদায় হও টেঁকে গুঁজি॥
রাজকুমারী যদি এড়ায় হাত
খোয়া যাবে তোমার পুঁজি॥”
চতুরা নারী যবে শিকার ফাঁদি
রাজবাটীতে গেল চলি,
এক ঠাঁই মিলিয়া কিঙ্করী-বাঁদি
কত কি করে বলাবলি॥
কেহ বলে “কি পেলি?” বলে সে নারী
আমায় পাসনি কি টের!
নেওয়া-থোয়ার ধার কারো না ধারি—
রানী যা দেন তাই ঢের!
গলে সঁপিল মোর সোনার হার—
ছুঁড়িয়া ফেলি দিনু তাহা!
অমনি মুখখানি হল যে তার—
দেখতিস যদি লো—আহা!
হাজার হোক আমি অবলা নারী—
চক্ষে এল মোর জল।
বলিলেম ‘করিব আমি যা পারি’
আর কি বলি তারে বল্॥
পথে আসিতে মোর পড়িল মনে—
মাদ্রাজী সেই মেয়েটা!
রানীব বেশে তারে সাজাব কনে,
বর তো আছে গড়াপেটা॥
রানীর কাছে গিয়ে সবাই শেষে
হাসির উঠাইল ঢেউ।
রানী বলিল শুনি “আমার বেশে
যেতে পারিস যদি কেউ—
সাজায়ে দিই তারে অঙ্গ ভরি
মণি-মুকুতা আভরণে,
শিখায়ে দিই, আর কেমন করি
পালা দিবে শঠের সনে॥”
রানীর, সবে, আজ্ঞা পেয়ে—
শিবের সেই বনে

সাজাইল রাজার মেয়ে
দাসী একজনে॥
আভরণে ঢেকেছে অঙ্গ
কে বলে রানী নয়।
হেনকালে আইল রঙ্গ
বুঝিয়া সু-সময়॥
সখীরা যবে রূপসীর
ঘোমটা দিল খুলি,
রঙ্গের নয়ন স্থির—
আড়ষ্ট পুতুলি!
ভাবে রঙ্গ "এত কালো—
এমন মোটা ঠোঁট!
রানী না হয়ে, হত ভালো,
বহিত যদি মোট!
কালোই হোক ধলোই হোক
তাহাতে কিবা করে।
যেমন যারে দেখে চোক
তেমনি শোভা ধরে॥
কুন্তল মস্তক-শোভী—
কালো তো শিরে ধরি!
দংশি ঠোঁট মধুলোভী
দিয়েছে মোটা করি।"
হেন ভাবি সঁপিল পত্রখানি—
উগরি যেন অনঙ্গ।
সখী বলি "শুনিব শ্রীমুখ-বাণী"!
পত্র পড়ে তবে রঙ্গ॥
পাঁচিশ ছাড়িল বাণ, পঞ্চবাণ চুবায়ে-চুবায়ে
পাঞ্চালীর কালো রূপ কালকূটে,
দ্বিগুণ পঞ্চ-নয়ন কাল-নীরে দিল রে ডুবায়ের—
মূর্খদের তবু কি নয়ন ফুটে!
তবু সেই কালাঞ্জন চক্ষে মাখি যাতনা নিভায়!
হায় রে আমার আজ সেই দশা!
কালিন্দীর কলেবরে কালি দেও রূপের প্রভায়—
কে তুমি গো যৌবন মদালসা!
এ মোর হৃদয়পুরী লঙ্কা-জিনি উঠিয়াছে জ্বলি—
ও তোমার দারুণ কটাক্ষ বাণে!

গজেশগঞ্জন-পদে ক্ষীণ প্রাণে কি হইবে দলি-
নির্জীবে সজীব কর প্রেমদানে॥
বলিল ছদ্মরানী "সখি লো বল—
ওরে বলা মোরে না সাজে।"
সখী বলিল তবে "চাতুরী-ছল
সখীর প্রাণে বড় বাজে॥
রূপ দেখিলে তবে নয়ন ভুলে—
সখী রে দেননি তা বিধি!
না জানি ফুল-ধনু কি হেন ফুলে
পরান দিল তব বিধি—
রেণু-পতনে যার হইয়া অন্ধ
কালোকে নিরখিছ সাদা?
কথা শুনি তোমার হয় গো সন্ধ
ধনেরই জান মর্যাদা।
সিংহাসন বলে পরশ-মণি
যে এক আছে জমকালো—
কুচ্ছিতেরে করে রূপের খনি—
অন্ধকার করে আলো!"
বলিল রঙ্গনাথ "রাজ্য? ছো!
পিরীতির কাছে রাজ্য!
রাজ্য প্রেমের কাছে! সহে না ওঃ—
যন্ত্রণা অনিবার্য।
রমণীই জানি প্রেমের মূল—
তোমরা বুঝিলে না প্রেম।
হীরাকে পরকোলা করিছ ভুল!
তবে গো বিদায় হলেম!"
বলিল এক সখী "সখীরে বধি
যাওয়া কি তোমায় সাজে?
সখীর দুনয়নে ঝরিছে নদী—
পরানে তাহা না বাজে?"
রঙ্গ বলে "প্রাণ ফেলিয়া রাখি
অঙ্গ কভু যেতে পারে?
আশ কি মিটে কারো অমৃত চাখি
সুধা-সমুদ্রের ধারে!"
সখী বলিল "যদি সখীরে চাও—
সখী রে পাবে নিরাপদে।

বাজ্য চাও যদি পাবে না তাও—
ডুবিবে কুল-নারী বধে॥
নিরখিল তোমায় কি যে ক্ষণে—
জানালার আড়ালে থাকি।
প্রেমের বীজ সেই পশিল মনে,
ফল উঠেছে এবে পাকি॥
সেই যে অবধি সখী 'প্রেম প্রেম' ধরিয়াছে ধুয়ো—
কাজকর্ম দেখে না শোনে না মুহু।
প্রেম এক চিনিয়াছে—সেই সাঁচা, আর সব ভুয়ো!
রাত্রি-দিন প্রাণ করে হু-হু-হু-হু!
কাল রাত্রে ঝাঁটায়ে ফেলেছে সখী সকল জঞ্জাল—
উন্মাদিনী হইলে আটকে কেবা!
সব রাজ্য সখীবে যৌতুক দিয়া চুকিযাছে কাল—
রাত্রি-দিন কবিবে প্রেমেরই সেবা॥"
"সখীরে যৌতুক দান!"
বলিয়া উঠে রঙ্গ।
ধড়াস করি উঠে প্রাণ
অবশ হল অঙ্গ॥
সামলিয়া বলিল রঙ্গ
"যৌতুক না কৌতুক।
শুনিযা তোমাদের ব্যঙ্গ
বিদরে মোর বুক।
না-তা না—তবে কিনা—ব্যঙ্গ
শুনিয়া হাসি পায়।
এতও জানো রঙ্গ-ঢঙ্গ।
গড় করি গো পায়।"
সখী বলে "হইলে শেষে
বাজ্যের কাঙাল।
এতদূব এগিয়ে এসে
ছাড়িয়া দিলে হাল।
ধন-বতন ঘর-দ্বার
হেলায় অবহেলি—
পীরিতি, যে, করেছে সার,
ফেলো না তারে ঠেলি!
তোমার যা রাজ্য আছে
তাই সখীব সোনা!

চায় শুধু তোমার কাছে
কৃপা-নয়ন-কোনা।"
রঙ্গ বলে চটি উঠি
বিরস করি মুখ
"ব্যাপার কি বল না ফুটি—
নহে কি কৌতুক?
মিছে কেন করিছ ব্যঙ্গ—
শিশু তো নাই কাঁচা।
বলিতে পারি ছুঁয়ে অঙ্গ
মন আমার সাঁচা!"
সখি বলে "সখি লো তুমি
বদন কেন ঢাকি!
জলাঞ্জলি দিলে ভূমি—
কি আর আছে বাকি।"
বলে ছদ্মরানী "নাথ কি আর বলিব—কি না জানো!
রাজকার্য রমণীর বিড়ম্বনা!
রাজ্যময় কেবলই কপট মনে কপাট ভেজানো!
রাজের ত্রিসীমা আর মাড়াব না
আমায় নাথ লয়ে চল—
চাই মোরে চরণে দলো,
চাই তোলো পালঙ্গে!"
"তা কি হয়" বলিল রঙ্গ
"রানী তুমি দেশের।
হইবে যে শাসনভঙ্গ
পাইলে লোকে টের॥"
বলিল ধনি "হা কপাল
দুঃখে পায় হাসি!
ছিনু রানী—গেছে সে কাল—
এবে চরণ-দাসী!"
এতেক বলি ধনি কাঁদে,
সখীরা পাতে কল।
রঙ্গের চাদরে বাঁধে
রূপসীর আঁচল॥
মজি গেল রূপসী ক্ষণেক বই রঙ্গের প্রণয়ে—
হাবভাব ঘোরালো হইয়া এল।
মাগীটা এগোয় যত রঙ্গ তত পিছোয় সভয়ে—

রোষে জ্বলে পা হইতে মাথার তেলো!
বলে ধনি "প্রাণস্বামী
মরায় কেন মারো!"
রঙ্গ বলে "পাগলামি
দেখিনি হেন কারো!"
বলে ধনি "না যাও নিয়ে
আটকি রব পথ।
অঙ্গের উপর দিয়ে
চালায়ো তুমি রথ॥"
"আসি আমি" বলিল রঙ্গ
উঠিয়া তাড়াতাড়ি!
"মানায় বটে রঙ্গ-ঢঙ্গ
এত না বাড়াবাড়ি!
শিবো-শিবো-শিবো-শিবো
চাদর কেন কাড়ো!
মালায় ঘাড় পাতি দিব
এখন মোরে ছাড়ো।"
"গিরে যে দেওয়া" বলে থামি
"করিল কোন্ জন!
ছাড়ি দেও আমায়—আমি
বাড়ি যাই এখন॥"
বসিতে বসে সুবদনী
চাদরে দিয়া টান।
চাদর ফেলি নৃপমণি
করিলা প্রস্থান॥
দশ হাত দূরে গিয়া বলে "আমি চলিলাম এবে,
অভিসন্ধি কি যে তোমাদের কিছু পেলাম না ভেবে।
স্বয়ম্বর-সভায় হইবে দেখা এত বলি রঙ্গ
রথে চড়ি তড়িঘড়ি পলাইলা, রণে দিয়া ভঙ্গ॥
নিমন্ত্রণপত্র পান সিংহাসনে বসাতে কুমারে ;
আকাশ ভাঙিয়া পড়ে মাথায় অমনি একেবারে॥
"সভা-মাঝে কেমনে দেখাব মুখ" ভাবে রাত্রিদিন।
সুখ-শান্তি গেল ঘুচি—মুখকান্তি হইল মলিন॥
বিরলে বসিয়া খালি উলটায়-পালটায় মুখে
"যৌতুক না কৌতুক" কিছুতে আর সন্দেহ না চুকে॥

ছদ্মবেশধারী উৎসর্গ
বা
উপসর্গ

শর্বরী গিয়াছে চলি! দ্বিজরাজ শূন্যে একা পড়ি
প্রতীক্ষিছে রবির পূর্ণ উদয়!
গন্ধহীন দু-চারি রজনীগন্ধা লয়ে তড়িঘড়ি
মালা এক গাঁথি ফেলি অসময়
সঁপিল রবির শিরে বলি এই "আশিসি তোমারে
অনিন্দিতা স্বর্ণ মৃণালিনী হোক
সুবর্ণ তুলির তব পুরস্কার। কুরূপার কারে
যে পড়ে সে পড়ুক খাইয়া চোক॥"

গুম্ফ-আক্রমণ কাব্য :

প্রথম সর্গ

প্রবীণ সাধুর সঙ্গে, বিপ্র-যুবা বিনা ভঙ্গে,
বহুকাল সখ্য-ডোরে বাঁধা।
বয়সের যে অনৈক্য, তার প্রতি নাহি লক্ষ্য,
সে অনৈক্যে প্রীতির কি বাধা॥
শুভদিনে শুভক্ষণে, উদয় হইল মনে,
বোলপুরে করিব গমন।
সুরম্য প্রত্যুষকাল, নিবেদয়ে দ্বার-পাল,
"অশ্বরথ প্রস্তুত রাজন।"
আনন্দ-উল্লাসে দোঁহে, চলে মহা-সমারোহে
নিমেষে পাইল গঙ্গাকূল।
মুহূর্ত না বিলম্বিতে, নিরখিল আচম্বিতে,
ভাগীরথী মহা হুলস্থুল॥
ব্যোমে উড়াইয়া ধূম, শব্দে কাঁপাইয়া ভূম,
হুনহুন আসে বাষ্পযান
ঝাঁকিল লোকের পাল, ক্ষুদ্র গাড়ি লয়ে মাল,
বেগে ধায় ব্যথিয়া পরান॥

রবিতাপে পেয়ে ব্যথা, ছায়াতরু-তলে যথা
পথিকজনের ঘুচে খেদ।
তরণীর বাতায়নে পদমাত্র পরশনে,
সব দুঃখ হইল বিচ্ছেদ॥
আসন গ্রহণ প্রতি, দোঁহার না হল মতি,
ইতস্তত করে সংক্রমণ।
দৈবের কি দেখ লীলা, জামা গায় স্বল্প ঢিলা,
উত্তরিলা এক মহাজন॥
শুভ্রকেশ শিরে ছাঁটা, যেন সজারুর কাঁটা,
অধিকাংশ নয়নগোচর!
অবশিষ্ট অংশোপরি টুপি শোভে আহা মরি,
তেলোমাত্র করিয়া নির্ভর॥
দেহখানি শুষ্ক-শীর্ণ, কে বলিবে জরাকীর্ণ,
অস্থিগুলি আছে মজবুত।
বয়স সত্তর-যাটি, খাড়া তবু যেন লাঠি,
পরাজয় মানে রবিসুত॥
মানুষটি নির্বিবাদী, ভদ্রতা-বিনয়-আদি
জিহ্বামূলে অনাহূত আসে।
নাহি বাধা নাহি দ্বন্দ্ব, নাহি কোনো ভালোমন্দ,
মনে যাহা বাক্যে পরকাশে॥
মৃদু-মন্দ ধীর গতি আইলেন তিনি তথি,
যাত্রী-দোঁহে দাঁড়াইয়া যথা॥
সহজ-মিষ্ট ভাষায় পরিচয় জিজ্ঞাসায়
ক্রমে-ক্রমে বিস্তারিল কথা॥
মোকর্দমা ছিল তাঁর, সম্ভাবনা জিতিবার
করিলেন তাহার বাখান
এই বলিলেন শেষে, "সেকালে ছেলেবয়েসে,
ইংরাজে আছিল ভালো জ্ঞান॥
আছিল প্রত্যয় দড়, ওরা সত্যবাদী বড়,
ভুলেও না কহে মিথ্যা-লেশ।
এবে একি চমৎকার, দেখি ভিন্ন ব্যবহার,
বঞ্চক-শঠের একশেষ॥
জোগাড় করিনু কত, ছ-মাস অনবরত
কত কব সে সব তোমায়।
এখন ভরসা হয়, মোকর্দমা হবে জয়,
বড় কষ্ট দিয়াছে আমায়॥"

নিজের কার্যের কথা, অন্যের কি মাথা-ব্যথা,
সে বোধ নাহিকো তাঁর মনে।
ভদ্রতার অনুরোধে, তাঁর বাক্য অবিরোধে
শিরোধার্য করিল দুজনে॥
এতেক যতেক প্রসঙ্গ, মুহূর্তে হইল ভঙ্গ,
প্রাচীন যাত্রীর পরমাদি।
গোঁপ তাঁর অমায়িক, ছাপিয়াছে দুইদিক,
শ্বেতবর্ণ এই অপরাধ!
মহাজন গোঁপ-নিষ্ঠ, হইলেন গোঁফাকৃষ্ট,
মন্ত্রবলে যেন সর্প ধরা।
সভ্যতার বাঁধ টুটি, কহিলেন, মুখ ফুটি,
কথাগুলি উপদেশ-ভরা॥
"অমন সুন্দর গোঁপ, ওতে না দিলে কলপ,
ভবে আসি কি তবে করিলে।
তোমার ও গোঁপখানি, সামান্য তো নাহি মানি,
তপস্যায় কারো ভাগ্যে মিলে!
ব্যয়মাত্র পাঁচ টাকা, একটি না রবে পাকা,
ইথে কেন করিছ কার্পণ্য।
নেড়া-গির্জে যাবামাত্র, মিলিবে অতি সুপাত্র,
গুণী-মাঝে যিনি অগ্রগণ্য॥
তাঁর হস্তে তব মোচ, পেয়ে কলপের পোঁচ
অমনি হইবে কালো মিশ।
অনায়াসে হবে ধন্য, যুবা-মধ্যে হবে গণ্য,
বয়ঃক্রম উনিশ কি বিশ॥
পাঁচটি টাকায় তরে, গোঁপ থাকে অনাদরে,
ইহা তো পরানে নাহি সয়।
টাকায় কি আসে-যায়, টাকা কি গো সঙ্গে যায়!
সৎকাজে করিয়া লও ব্যয়॥
আমার এ গোঁফখানি এ তো অতি ক্ষুদ্র-প্রাণী,
তোমার উহার তুলনা।
কটাক্ষেতে কলপের, চেহারা ফিরেছে এর,
ব্যাপারটি ভেলকির-প্রায়॥
হেন উপদেশ, করি শেষ,
নিজ গোঁফের কেশ, গরবে হেরে।
নেত্র লভি তৃপ্তি, পায় দীপ্তি,
নিখিল গোঁফময়, আদরে ফেরে॥

(আহা)　　আপন গোঁফময়
　　　　নয়ন ফেরে!
(মরি)　　নিখিল গোঁফময়
　　　　নয়ন ফেরে!
দুজনা অবাক! লাগে তাক্!
ফুলিছে মুখ-নাক, হাস্যের লাগি।
চাপি রাখে তায়, ভদ্রতায়,
চাপিয়া রাখা দায়, উঠিলে চাগি॥

ইতি শ্রী গুম্ফ-আক্রমণ কাব্যে গুম্ফোৎকর্ষ বিধান নামকোহয়ং প্রথমঃ সর্গঃ

দ্বিতীয় সর্গ

আরম্ভে নূতন সর্গ　　শুন গো পাঠকবর্গ
　　সবিনয়ে এই ভিক্ষা চাই।
হও আসি মম সঙ্গী　　চতুর্দশ বর্ষ লঙ্ঘি,
　　উজান বাহিয়া লয়ে যাই॥
প্রাচীন যাত্রীটি যিনি,　　বহুপূর্বে তারে চিনি,
　　দক্ষিণ প্রদেশে যবে বাস।
গোঁপের গোড়ার কাছে,　　সবে পাক ধরিয়াছে
　　রাহুকে বা শশী করে গ্রাস!
একটুকু ক্ষান্ত হও,　　অর্ধগ্রাস হতে দেও,
　　তাহা নহে, একি বিপরীত!
পাকের সবে শৈশব　　এ সময়ে উপদ্রব
　　তার প্রতি হয় কি উচিত?
কিন্তু অদৃষ্টের লেখা,　　খণ্ডেনাকো এক রেখা,
　　সেইকালে বাবু একজন
মাথায় জরির তাজ,　　শরীরে জমকালো সাজ,
　　করিলেন কাছে আগমন॥
বৃদ্ধ তিনি বিচক্ষণ　　কিন্তু সক বিলক্ষণ!
　　দেখিলে তাঁহার ভাবগতি
মনে হয় অনুমান,　　আছে জুড়াবার স্থান—
　　দ্বিতীয় পক্ষের রূপবতী॥
আপনি সুভোক্তা বড়,　　অন্যে খাওয়াইতে দড়
　　দিন-রাত্রি জ্বালিতেছে চুলি॥

চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়, অতিমাত্র উপাদেয়
ভুঞ্জে লোক দুঃখ-শোক ভুলি॥
মশলা কোটার চোটে, হামানদিস্তায় ওঠে
ঠুং-ঠুং শব্দ অবিরল।
সৌরভ তথায় কিবা বিচরিছে রাত্রি-দিবা,
মনোভৃঙ্গে করয়ে পাগল॥
একপ্রস্ত ভাজাভুজি, সম্মুখে হইলে পুঁজি
আর তাহা ফিরিয়া না যায়।
তারপরে উপনীত, লুচি-মোণ্ডা মনোনীত,
ফলমূল পরের দফায়॥
বৃহৎ রুপার থালে, পাচক ব্রাহ্মণ ঢালে,
মাংসের পোলাও গাদা-গাদা।
কি গুণ পাঁঠার হাড়ে, অম্বলের তার বাড়ে,
কে বুঝিবে ইহার মর্যাদা॥*
কেবল আহারদানে, কভু না সন্তোষ মানে
বলবৎ হিতৈষণা তাঁর।
এ বাড়ি ও বাড়ি ফিরি, সব তাতে কর্তাগিরি!
নাহি তায় বিষয়-বিচার।
ভর্কতির বেগ তাঁর, সামলায় সাধ্য কার,
সাধুটিরে বলিতেন "মুনি"।
(শ্বেত হইলে গোঁফ-ভুরু, মুনিত্বের হয় শুরু
এ তত্ত্বটি জানেন না উনি!)
কি মনে করিয়া এবে, সাধু নাহি পায় ভেবে,
এত প্রাতে কেন আগমন!
আস্তে-ব্যস্তে ত্বরান্বিত, করি তাঁরে সম্মানিত,
বসিবারে দিলেন আসন॥
বাবুজি ক্ষণেক পরে কহিলা আগ্রহ-ভরে
"প্রস্তাব আমার এক আছে—
ভাবিতেছি পূর্বাবধি। শোনেন আপনি যদি,
বলি তবে আপনার কাছে॥
কত আর মৌন রব— আসন্ন বিপদ তব!
এইবেলা হউন সাবধান।
দেখেন না আরশিতে, কি হতেছে গোঁপটিতে?
প্রতিকার উচিত বিধান!

* পাঁঠার হাড়ের (মাংসের নহে—হাড়ের) অম্বলের ইনি বিশেষ মর্মজ্ঞ ছিলেন।

হেন গোঁপ মনোলোভা, নিভ নিভ তার শোভা!
আর কি উচিত অবহেলা?
যদি পরামর্শ চান, কলপ শীঘ্র লাগান!
লাগান কলপ এইবেলা।
মস্ত গুণী—শিল্পী ভারি —অদ্যাই পাঠাতে পারি!
কি আজ্ঞা করেন গুরুদেব?
শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি, বিলম্বে কার্যের হানি
শুভস্য শীঘ্রং অতএব।"
সাধুটি এতেক শুনি, অন্তরে প্রমাদ গুণি
সাত-পাঁচ ভাবিয়া কহেন!
"করিলাম শিরোধার্য! কিন্তু প্রকৃতির কার্য
অনিবার্য—মাপ করিবেন।"
বাবুজি সদয় মতি, না বুঝিয়া ভালো গতি
আপাতত হইলেন ক্ষান্ত।
সাধু প্রবোধিল মনে, বাঁচিলাম এতক্ষণে!
একি ঘোর বিপদে আক্রান্ত!
সাধু বিবেচক বটে, কিন্তু না আইল ঘটে—
হিতৈষণা কত বেগ ধরে।
যার যবে চাপে ঘাড়ে, স্বপ্নে না তাহারে ছাড়ে!
চাপা দিলে দাপাদাপি করে॥
রবি না হইতে অস্ত বার হন সমীপস্থ,
ভবি কভু ভুলিবার নয়।
সাধু ভাবে মনে-মনে, "পুনর্বার কি কারণে
গতিক বেয়াড়া অতিশয়।"
পূর্ব্ববৎ আক্রমণ, কি কহিব বিবরণ,
বিজ্ঞ বোঝে অত্যল্প বচনে।
গোঁপ লয়ে টানাটানি, দিনরাত্রি নাহি মানি
লাগিলেন সাধুর পিছনে॥
বিনয়েতে সাধু কহে (বুঝি বা খেদাশ্রু বহে—
এইরূপ মুখের আকৃতি।)
"ছাড়ুন-ছাড়ুন মোরে, নিবেদি চরণ ধরে
জানেন তো আমার প্রকৃতি!"
বাবুর দয়ার্দ্র চিত্ত, সাধুরে করি নিবৃত্ত,
বলে "সে কি কথা মুনিবর!
এতই অনিচ্ছা যদি, ক্ষান্ত হইনু অদ্যাবধি ;
হবেন না আপনি কাতর।

এইরূপে দুই পক্ষ,　　বিস্তারিয়া নিজ পক্ষ
নিঃশব্দে হইল তিরোহিত।
একদিন বাঙ্গালায়　　সাধু বসি নিরালায়
ভাবেতে আছেন বিমোহিত॥
দেখেন ইত্যবসরে,　　(হরে-হরে-হরে-হরে!)
একে নেড়ে তাহে গুপ্তচর!
কিসের কি পাত্র হাতে—　　কী বস্তু যে আছে তাতে—
সাধুর জ্ঞানের অগোচর
সেলামিয়া বারে-বারে,　　আইল সে গৃহদ্বারে
সাধু ভাবে "এ কি পাপ-দৃশ্য।"
বলে সে দুয়ারে থামি　　"কলপওয়ালা আমি
পাঠালেন আপনার শিষ্য॥"
সাধু বলে "একি জ্বালা,　　এইবেলা শীঘ্র পালা
নতুবা উচিত শিক্ষা পাবি!"
যবন ঢুকিয়া ঘরে　　কলপ বাহির করে!
কোথায় গড়ায় তাই ভাবি!
সাধু আর নাই সাধু　　(কে যেন করিল জাদু)
ফোঁস-ফোঁস করে নাসা-ফণী।
রক্তবর্ণ চক্ষুদুটি—　　ধরেন-ধরেন টুঁটি—
শ্মশ্রুধারী হটিল অমনি॥
চউকাট ঠিকরিয়া,　　পড়িল সে হাঁ করিয়া
পাড়াসুদ্ধ পড়িল ঝুঁকিয়া।
যবন ঝাড়িয়া দাড়ি,　　চলি গেল তাড়াতাড়ি,
দুই হাতে সেলাম ঠুকিয়া॥
জ্ঞান করি লব্ধ, হয়ে স্তব্ধ,
মুখে নাহিকো শব্দ, ভাবে মুনীশ
"হইত অগত্যা, নরহত্যা!
খেপিলে রক্ষা নাই মনো-মহিষ।
বেচারা গরিব, ক্ষুদ্র জীব,
দোষ করিল মনিব, ওর কি দোষ!
করিলি সম্পূর্ণ, দর্পচূর্ণ,
রে হলাহলপূর্ণ, দুরন্ত রোষ!

ইতি শ্রী গুম্ফ-আক্রমণ কাব্যে পূর্বাক্রমণনামকোহয়ং দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

তৃতীয় সর্গ

চড়িয়া মনের তরী, কালের তটিনী তরি
ফিরে চল যাই সেইক্ষণে।
বাষ্প-যানে যাত্রী তিন, মনোসুখে যেইদিন
কাল হরে মিষ্ট আলাপনে।।
তরণী তীরের প্রায়, চকিতে ওপারে যায়
যাত্রীসবে দ্রব্যাদি গুছায়।
পশ্চাতে রাখিয়া পোত, চলিল লোকের স্রোত
পিপীলিকা হারি মানে তায়।।
উগারি ধূমের ধ্বজ, ফুঁসিছে আয়স-গজ,
অগ্নিময় অঙ্কুশের তাপে।
গমনের অনিচ্ছায়, বারেক আগু-পিছায়,
তক্-তক্ ধক্-ধক্ দাপে।।
প্রথম ঘণ্টার রোল, লোকের বিষম গোল,
দ্বিতীয় ঘণ্টায় সব চুপ।
গজরাজ অগ্রসরে, ক্রমে নিজ মূর্তি ধরে,
দূরত্বের সংহার-লোলুপ।।
পশ্চাতে শকট-যূথ, দেখিবারে অদ্ভুত,
টানি লয়ে চলিল গৌরবে।
পদ-বিমর্দন-চোটে, মেদিনী কাঁপিয়া ওঠে,
বিদরে আকাশ নাসা-রবে।।
সর্বজন হিত-কাম ভদ্রতার এক ধাম,
কলপ-বল্লভ মহাজন।
অল্প উপলক্ষ পেলে, কিবা বৃদ্ধ কিবা ছেলে,
সবা-প্রতি করেন যতন।।
লঙ্ঘিয়া নগর-গ্রামে, আড্ডায় যখন থামে,
করিবর হাঁপ ছাড়িবারে;
মহাজন গুম্ফধারী, পাত্রে করি লয়ে বারি
চৌদিকে তাকান বারে-বারে।।
সহসা করিতে পান, না করেন ভাল জ্ঞান;
দিতে যান তাহা সাধুবরে।
মনে উপজিতে তর্ক, হইয়া কিছু সতর্ক,
কোন্ জাতি জিজ্ঞাসেন পরে।।
সাধু টানি লয়ে হস্ত, বলেন "আমি কায়স্থ,"
কহিলেন তবে মহাজন

"সেবি আমি অহিফেন, যদি অনুমতি দেন,
আমি আগে সাধি প্রয়োজন।।
দুখ সহে বিনা ক্লেশে, আমাদের এ বয়েসে
অহিফেন বড় অনুকূল।
অহিফেনে আয়ু বাড়ে, মজবুতি হয় হাড়ে,
শীঘ্র নাহি পাকে গোঁপ-চুল।।"
হেন কথা হইতে সাঙ্গ, মাতঙ্গ সে আয়সাঙ্গ,
মেমারির আড্ডায় থামিল।
গুছাইয়া দ্রব্য-আদি, মহাজন নির্বিবাদী,
শিষ্টাচার করিয়া নামিল।।
হেতায় নিরালা পেয়ে, পরস্পর মুখ চেয়ে,
মনোসাধে হাসিল দুজনা।
থামিলে হাস্যের কোপ, সাধু বলে "পাপ গোঁপ
কামাইলে যায় যে যন্ত্রণা!"
বিপ্র কহে হাস্যভরে, এমনো কি কাজ করে,
গোঁপতুল্য আছে কি রতন।
কালো গোঁপ মনোলোভা, বাড়ায় মুখের শোভা
পাকিলেই বিজ্ঞের লক্ষণ।।
গোঁপের অবহেলায়, বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়,
তা দিলে জোগায় আসি তূর্ণ।
মহা-মহা গুম্ফী যাঁরা, দিক্‌পাল-সমান তাঁরা,
অবনী তাঁদের যশে পূর্ণ।।
একি মোর পাগ্‌লামি! গোঁপের মাহাত্ম্য আমি
বচনে কি ফুরাইতে পারি?
পঞ্চমুখে পঞ্চানন, চেষ্টা পেয়ে ক্ষান্ত হন,
বাণী হন বাণীর ভিখারি।।
শুনিলে সুশ্রাব্য, এই কাব্য, কবি-কুল-অভাব্য
মধুর ছটা।
লভে ইষ্টসিদ্ধি, গোঁপ বৃদ্ধি, যে চায় যে সমৃদ্ধি,
কালো কি কটা।।
পড়ে যেই লোক এই শ্লোক, পায় সে গুম্ফলোক
ইহার পরে।
যথা গুম্ফধারী, ভারী ভারী, গোঁফের সেবা করি,
সুখে বিচরে।।

ইতি শ্রীগুম্ফাক্রমণ কাব্যে গুম্ফমাহাত্ম্য নামকোহয়ং তৃতীয়ঃ সর্গঃ
সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ

মেঘদূত :

পূর্বমেঘ

কুবেরের অনুচর কোন যক্ষরাজ
কান্তা-সনে ছিল সুখে ত্যজি কর্ম-কাজ।
ক্রোধভরে ধনপতি দিল তারে শাপ—
"বর্ষেক ভুঞ্জিবে তুমি প্রবাসের তাপ!"
প্রবাসে যাইতে হবে নাহি তায় খেদ,
ভাবে কিন্তু দায় বড় প্রিয়ার বিচ্ছেদ!
সে মহিমা নাহি আর নাহি সে আকৃতি,
রামাচলে গিয়া যক্ষ করে অবস্থিতি!
রবি-তাপ ঢাকা পড়ে বিপিন বিতানে,
পবিত্র যতেক জল জানকীর স্নানে।*
ভাবনায় শুযে তায় অঙ্গ সমুদায়,
হস্ত হতে খসি পড়ে স্বর্ণের বলয়।
আষাঢ়ের আগমনে দেখা দিল পরে
দিব্য এক মেঘ উঠি পর্বত-উপরে;
দেখিতে হইল আর এমনি মতন—
করী যেন বেলা-ভূমে হানিছে দশন।
ঘনোদয়ে সুখীদেরও টলি যায় মন।
কেমনে থাকিবে স্থির বিবাসী যে জন।।
হইল যক্ষের মনে,—প্রেয়সীর ঠাঁই
কুশল-সংবাদ মোর কেমনে পাঠাই?
মেঘে দিয়া হেন কার্য করিব সাধন।
এতেক করিতে মনে আইল শ্রাবণ।
নানা জাতি পুষ্প আনি অর্ঘ্য বিরচিয়া,
অতঃপর জলধরে কহে সম্ভাষিয়া—
অচেতন মেঘে সে চেতন করি মানে,
স্মরের প্রভাব এত বিরহীর প্রাণে।
হে মেঘ! তোমায় আমি জানি সবিশেষ,
পুষ্কর বংশেতে জাত খ্যাত সর্বদেশ।

এই পর্বতোপরি জানকীর সহিত রামচন্দ্র কিয়ৎকাল বসতি করিয়াছিলেন।

বিধির বিপাক-হেতু পড়েছি সঙ্কটে,
আনুকূল্য মাগি তাই তোমার নিকটে।
মহতে যাচ্ঞা যদি নিরর্থকও হয়,
সেও ভালো, তথাপি অধমে কভু নয়।
তাপিতের তাপ হর স্বভাব তোমার—
ধরারে দেখিলে খরা ত্যজ বারিধার;
সারা হল মনস্তাপে প্রেয়সী আমার,
বাঁচাও হে তারে মোর দিয়ে সমাচার।
যে স্থানে অলকাপুরী থাকে যক্ষগণ,
যাইতে হইবে তব সেই নিকেতন।
বাহির উদ্যানে বসি বিরাজেন হর,
ভাল-শশী আলো করে যত বাড়ি-ঘর।
বায়ু-পৃষ্ঠে করি ভর আঁধারিয়া দিক্
হইবে যখন তুমি আকাশ-পথিক,
প্রাণেশ আসিবে দেশে এ আশ্বাসে ভুলি।*
বিরহিণী তোমায় দেখিবে আঁখি তুলি।
তোমা-দৃষ্টে বাঁচে কেবা না দেখি প্রিয়ায়,
পরাধীন আমি তাই আছি এ দশায়!
হিল্লোল দিতেছে দেখ বায়ু অনুকূল,
চাতক তোমার সাথে যাইতে ব্যাকুল;
আকাশে বেঁধেছে মালা বলাকার দল,
মনোমত সঙ্গী তব ইহারা সকল।
দেখিবে নিশ্চয় গিয়া প্রেয়সীর স্থানে
দিবস গণনা করি বেঁচে আছে প্রাণে।
কেন না, কুসুম-সম অবলার মন—
আশা-বৃন্তে করি ভর সামলে পতন।
মানস-সরসী-বাসী যত হংসকুল
শুনিয়া গর্জন তব হইবে ব্যাকুল,
ছাড়িয়া সকলে আর মানস-জলধি
সহযাত্রী হবে তব কৈলাস অবধি।
অনেক দিনের সখা কৈলাস তোমার,
শ্রীরামের পদচিহ্ন কটিতে যাহার;
গিয়া আলিঙ্গন দিবে তারে যে সময়
উথলিবে পরস্পর সুখের প্রণয়।

---

*পূর্বকালে এইরূপ প্রথা ছিল যে গৃহস্থ বিদেশীরা বর্ষাঋতুর প্রারম্ভে স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাগমন করিত।

প্রেমাশ্রু ঝরিবে তব নব-বৃষ্টি-জলে,
বাষ্পের উদ্রেক আর হইবে অচলে।
কোথা-কোথা হয়ে যাবে পূর্বে শুন বলি,
গিয়া কি কহিবে, পরে বলিব সকলি।
কোন্-কোন্ নদীর তুলিয়া লবে নীর,
অতিথি হইবে পথে কোন্ বা গিরির।
অনায়াসে পাবে যাতে সকল সন্ধান—
কহিতেছি তোমায় করহ অবধান।
এ স্থান হইতে তুমি করিয়া উত্থান
উত্তর-মুখিন হয়ে করিবে প্রয়াণ।
"একি ঝড়! মাগো-মাগো দেখে লাগে ডর,
উড়াইয়া ফেলিল বা গিরির শিখর!"
হেন বলি সিদ্ধা যত চমকিয়া প্রাণে,
বারেক দিবেক আঁখি তোমা দেহপানে।
দেখা দিবে তখন সমুখে ইন্দ্রধনু—
নানা রত্ন আভায় শোভয়ে যার তনু;
ফুটিবে তাহাতে তব রূপের মাধুরী,
শিখিপুচ্ছে শ্যাম যথা মন করে চুরি!
মাল-ক্ষেত্রে অনন্তর হবে উপনীত,
জল পেয়ে ধরা হবে সৌরভে পূরিত।
জানে না কৃষকবধূ ভুরুর বিলাস;
চাষের বিধাতা তুমি—তাদের বিশ্বাস।
তা-সবারে তুমি যবে দিবে দরশন—
পি'বে গো তোমায় তা'রা ভরি দু-নয়ন।
দূরে গিয়া হবে যবে শ্রম-নিমগন
আম্রকূট শিখরীর পাবে দরশন।
দাবাগ্নি থামিবে তার তোমার কৃপায়,
মাথায় করিয়া তাই পূজিবে তোমায়।
চূড়ায় আছহ তুমি শ্যামল-বরন,
নিম্নদেশ আম্রফলে পাণ্ডু-দরশন।
দেখিবেন দেবগণ পরম কৌতুকে,—
স্তনের উদয় যেন ধরণীর বুকে।
নানা স্থানে নিকুঞ্জ শোভয়ে মনোহর,
বিহার করয়ে যথা নাগরী-নাগর।
রেবা নদী দেখিবারে হয় যদি মন,
কিয়ৎ বিশ্রাম করি করিবে গমন।

নদীরে দেখিতে পাবে ক্ষণেকের পর,
বিন্ধ্যপদে শোভে যার শীর্ণ কলেবর;
পাষাণ-রাশির মাঝে শুভ্রধারা ঝরে,
মালাছড়া শোভে যেন করি-কলেবরে।
শাখা-পত্র ফল-ভরে স্রোতোমুখে পড়ি
জামের কানন যত যায় গড়াগড়ি।
চঞ্চুপুটে চাতক লইছে বিন্দুজল,
দেখিছে কিন্নরীগণ, চিত্তে কুতূহল।
সারি গাঁথি বকপাঁতি যাইছে উড়িয়া,
তাহাদেরো একে-একে দেখিছে গুনিয়া।
ছাড়িবে এমনি বেলা ধ্বনি একবার,
থমকিবে দিগ্-দশ ধমকে তাহার।
অমনি কিন্নরী-সবে সারা হয়ে ত্রাসে
আঁকড়িয়া ধরিবে—যে যারে ভালোবাসে।
সঙ্কল্প যদিও তব সত্বর গমন,
দেখিতেছি তবু কাল-বিলম্ব-কারণ।
গিরিরাজি রহে সাজি নানাবর্ণ ফুলে,
নড়িতে চাবে না তুমি সুগন্ধেতে ভুলে।
ময়ূরেরা ডাকিতে-ডাকিতে কেকারবে
অগ্রে আসি দাঁড়াইলে, গা তুলিবে তবে।
আগু-বাড়াইয়া দিবে তাহারা তোমায়,
তখন গিরির কাছে লইবে বিদায়।
উত্তরিবে যবে তুমি দশার্ণায় গিয়া,
সৌরভে পূরিবে বন কেতক ফুটিয়া।
বড়-বড় বৃক্ষ যত পল্লবে নিবিড়,
শাখে-শাখে দেখা দিবে বায়সের নীড়।
যত আর জম্বুফল—পাকি দলে-দলে
শ্যাম শোভা ধরাইবে বনান্ত-সকলে।
দেখিয়া তোমার এবে মনোরম ঘটা,
কিছুদিন রবে হেথা হংস যত কক-টা।
ত্রিভুবনে বিখ্যাত বিদিশা রাজধানী,
কি কব তাহার আমি অপূর্ব বাখানি!
বেত্রবতী নদী সেথা অপরূপ শোভে—
মাতিবে দেখ্‌চি তুমি পড়ি তার লোভে।
তরঙ্গ ভ্রূভঙ্গে সাজে জলময় মুখ,
চুম্বি তারে তোমার কত-না হবে সুখ!

শর-শর শব্দ হয় তীরদেশে তার,
কামিনী প্রকাশে যেন মনের বিকার।
গিরি এক আছে সেথা, নীচ তার নাম;
তদুপরি ক্ষণকাল করিবে বিশ্রাম।
গিরির কদম্ব যত হবে বিকশিত—
তোমায় পাইয়া যেন পুলকে পূরিত।
জুঁয়ের কানন যত দেখিবে সেথায়,
শীতল করিও সবে বৃষ্টি দিয়া গায়।
মালিনী বেড়ায় কত ফুল তুলে-তুলে,
কর্ণে গোঁজা পদ্মফুল পড়ে ঢুলে-ঢুলে।
রবি-তাপে তারা অতি হইবে আতুর,
তুমি গিয়া ছায়া দিয়া করো শ্রম-দূর।
যদিও পথের ফেরে পড় বৃথা দায়ে
উজ্জয়িনী যাইতে লয়ো না কিছু গায়ে।
পৌরাঙ্গনা সেথা যত শীঘ্র সবাকাব
চমক খাইবে আঁখি তড়িতে তোমার।
সে সব আঁখির ঠারে না মজিলে যদি,
বঞ্চিত হইলে বড় জীবন অবধি।
নির্বিন্ধ্যা নদীর স্থানে গিয়া তারপর
সুখরস আস্বাদিতে পাবে বহুতর।
পরিধানবস্ত্র তার খসে স্রোত-ছলে,
হংসমালা চন্দ্রহার কিবা বোল বলে।
নাভি তার ঘূর্ণাজলে রহে প্রকটিত,
দেখাইবে হাব-ভাব কতই সরিৎ।
যেহেতু জানিও স্থির, নারী সবাকার।
প্রথম প্রণয়-ভাষ বিভ্রম বিকার।
যাইবে তাহার পর সিন্ধুনদী-কাছে,
সূক্ষ্ম জলধার হয়ে বেণী যার আছে;
জীর্ণপাতা ঝরি-ঝরি তট-বিটপীর
হয়েছে পাণ্ডুরচ্ছবি সুতনু শরীর।
বিরহের অনুরূপ এসব লক্ষণ
দেখাইতে সে তোমায় করিবে যতন।
অবন্তী হইয়া যাবে উজ্জয়িনী পুরী
বর্ণনে যাহার পুরে কাব্য ভুরি-ভুরি।
স্বর্গবাসী কেহ যেন শেষ পুণ্যবলে
স্বর্গখণ্ড আনি এক রেখেছে ভূতলে।

শিপ্রার বাতাস পেয়ে সারসেরা সব
ছাড়িবে মত্ততাবশে পটু উচ্চরব।
পদ্মের সৌরভ আর আনি সে পবন,
কামিনীর দেহজ্বালা করিবে হরণ!
কিবা মনোহর সাজে অট্টালিকা সব,
ঘরময় ব্যাপি রয় ফুলের সৌবভ।
কামিনীর পায়ের আল্‌তার রাঙা দাগ
স্থানে-স্থানে শোভে যেন অরুণের রাগ।
এ সব সুন্দর স্থানে শ্রম করো দূর,
তোমা-পানে লক্ষ করি নাচিবে ময়ূর।
গবাক্ষ হইতে উঠি মাতাঘসা চুর
মিশিবে তোমার গায়ে প্রচুর-প্রচুর।
অনন্তর যাবে তুমি শঙ্করের ধাম,
পুণ্যলাভ হেতু যদি থাকে মনস্কাম।
শোভে তার চারিপার্শ্বে উদ্যান-কাননে,
হেলিতেছে তরুগণ সুগন্ধ পবনে।
প্রভুর কণ্ঠের আভা তব কলেবরে,
ভূতগণ সে-কারণ দেখিবে সাদরে।
দেব-প্রভু মহাকাল আছেন সেখানে,
যাবে তুমি একবার তাঁর বিদ্যমানে।
যাবৎ তপন-দেব না যান সরিয়া,
তাবৎ থাকিবে তুমি ধৈরজ ধরিয়া!
অতঃপর সন্ধ্যাপূজা হলে উপনীত,
গর্জনে করিবে সিদ্ধ বাদ্য মনোনীত।
চামর হেলায় তাবে বাবাঙ্গনা জুটি,
ক্ষণে-ক্ষণে নূপুরের উঠে বোল ফুটি।
নখক্ষতে তারা সবে পেয়ে বৃষ্টি-জল,
ছাড়িবে তোমার পানে কটাক্ষ তরল।
সন্ধ্যারাগে ঘুচি তব দেহেব কালিমা
হইবে জবার মত লোহিত প্রতিমা।
বিরাজ করিবে ইথে আকাশ-উপর,
নৃত্যে মাতিবেন যবে দেব মহেশ্বর।
রক্তমাখা হস্তি-ছাল তাঁর বড় প্রিয়,
মিটাইয়া হেন সাধ তুমি দেখা দিও।
ভবানী কিঞ্চিৎ তাহে হৃদে ত্রাস পেয়ে,
দেখিবেন একদৃষ্টে তোমা-পানে চেয়ে।

পথ-ঘাট ঢাকা দিবে যখন তিমির—
সূচিতে বুঝি বা বিঁধে এমনি নিবিড়,
যাইবে কামিনীগণ প্রিয়-নিকেতনে,
তাদেরে দিও না ত্রাস ভীষণ গর্জনে
পাথরে সোনার কষ দেখিতে যেমন
বিদ্যুতের আলো দিবে তেমনি মতন।
সে রাত্রি কোথাও কোনো অট্টালিকা-ছাতে
যাপন করিবে সুখে তড়িতের সাথে।
খেলাইয়া-খেলাইয়া সারাটি রজনী
সারা হবে তোমার চপলা সুবদনী।
ভানু শেষে দেখা দিবে আকাশে যখন,
বিলম্ব না করি আর করিবে গমন।
হেনকালে খণ্ডিতা কামিনী-সবাকার
প্রিয়েরা পুঁছিয়া দিবে নেত্র-বারিধার।
অতএব তপনের পথ এ সময়
আটক করনা যেন হয়ে নিরদয়।
যে নলিনী সারারাত হতেছিল সারা
বরষিয়া অবিরত শিশিরাশ্রুধারা,
খুলি তার দলময় মুখের ঘোমটা,
স্বকরে পুঁছিবে রবি অশ্রু ফোঁটা-ফোঁটা।
এ সময়ে যদি তার কর কর-রোধ
সামান্য হবে না তবে তোমাপরে ক্রোধ।
প্রসন্ন মানসরূপী গম্ভীরার জলে
প্রবিষ্ট হইবে পরে প্রতিবিম্ব-ছলে।
সফরী খেলিছে সেথা সদাই চঞ্চল,
নদীর জানিবে তাহা দৃষ্টি নিরমল।
বৃষ্টি-জলে উচ্ছ্বসিত ক্ষিতির সৌরভে
সুশীতল সমীরণ পরিপূর্ণ হবে।
শীতল বাতাস পেয়ে অমনি সত্বর
পাকিয়া উঠিবে যত কানন-ডুম্বর।
দেবগিরি যাইবারে সাজিবে যখন,
তোমায় সে শীতবায়ু করিবে ব্যজন।
তথা গিয়া স্কন্দ দেবে দেখিয়া সাক্ষাৎ
মস্তকে করিবে তাঁর ফুল-বৃষ্টিপাত।
দেবসৈন্য ভয়শূন্য তাঁহারি রক্ষণে,
স্ফুরয়ে প্রতাপ তাঁর জিনিয়া তপনে।

গিরিপরে দ্বিগুণ হইবে তব নাদ,
ময়ূর নাচিবে তায় পাইয়া আহ্লাদ,
পুচ্ছ খণ্ড লয়ে যার উমা মৃদুহাসি
কর্ণেতে রাখেন সদা পুত্রে ভালবাসি।
কার্তিকেয় দেবতার করি আরাধন,
তদুত্তর যাইবে গোমতী-নিকেতন।
জল-লাগি বীণা-তন্ত্রী পাছে হয় শ্লথ,
সিদ্ধ দ্বন্দ্ব* তোমায় ছাড়িয়া দিবে পথ।
প্রতিমা পড়িলে তব গোমতীর জলে
গন্ধর্বে দেখিবে শোভা দিব্য কুতূহলে।
নদীরে দেখিবে তারা, যেন মুক্তাহার—
ইন্দ্রনীল মণি তুমি মধ্যদেশে তার।
হেতা হতে যাবে যবে হইয়া বিদায়
দশপুর-বধূগণ দেখিবে তোমায়।
ভুরুর ভঙ্গিমা কিবা চাহনি-সময়ে,
কৃষ্ণসার-প্রভা কিবা চক্ষে প্রকাশয়ে।
চঞ্চল কুসুমে যথা ঘুরে-ফিরে অলি,
নয়নে তেমনিভাবে শোভে তারাগুলি।
ব্রহ্মাবর্তে অতঃপর হয়ে উপনীত
কুরুক্ষেত্র দরশনে হবে চমকিত।
কত ক্ষত্রিয়ের মুখ—তীক্ষ্ণ শরাঘাতে
হয়েছিল পদ্ম যথা তব ধারাপাতে।
প্রতিবিম্বে পরশিয়া সরস্বতী-জল
বর্ণে মাত্রে রবে কালো, অন্তরে নির্মল।
যে হালা-মদের তরে পাগল পরান,
ছাড়ি—কান্তা-সনে তাহা একপাত্রে পান,
পূর্বে বলরামদেব আসি শুষ্কগলে
মিটাতেন তার সাধ হেন নদীজলে।
কনখল সন্নিধানে দেখিবে গো গিয়া
পড়িছেন গঙ্গাদেবী হিমাদ্রী বাহিয়া
গৌরীর ভ্রূকুটি দেখি হাসি ফেন-ছলে
উর্মি-হস্ত দেন যিনি শিবের কুন্তলে।
জাহ্নবীতে ছায়া নিজ করিবে নিধান,
যমুনা মিশিল যেন হবে অনুমান।

সিদ্ধনামে একপ্রকার অলৌকিক পুরুষের কথা কাব্য পুরানাদি শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে ; ইহারা গন্ধর্ব, কিন্নর অমরা প্রভৃতির দল-ভুক্ত।

বিশ্রাম করিবে পরে হিমাদ্রি-উপর,
মৃগনাভে সুগন্ধি যাহার পরিসর।
ধবল অটল হিমে শিখর যতেক,
শিলাতলে আছে বসি হরিণ অনেক।
হেনকালে বায়ু যদি হইয়া প্রবল
সরল তরুর কাঁধে জ্বালায় অনল,
দাবানলে গিরি হবে যন্ত্রণায় সারা;
ঘুচাইও তুমি তাহা ত্যজি বারিধারা!
পরদুঃখ যাহাতে না হয় প্রশমন,
এমন সম্পদে কিবা আছে প্রয়োজন?
তোমারে দেখিবে যেই সরভ-সকল
তাড়াইয়া ধরিবারে প্রকাশিবে বল;
শিলাবৃষ্টি বরষিয়া খরতর ধারে
ছিন্নভিন্ন করিবে তাদের সবাকারে!
শঙ্করের পদচিহ্ন প্রস্তরে নিহিত
তথাকার একস্থানে আছে প্রকাশিত।
দরশন-মাত্রে হয় পাপতাপ ক্ষয়,
পরিণামে মুক্তিলাভ নাহিকো সংশয়।
গিয়া তথা ভক্তিভরে হইয়া প্রণত
প্রদক্ষিণ করো যেন তারে বিধিমত।
বংশে-বংশে পবন ফুকরে মনোহর,
ত্রিপুর-বিজয় গায় মাতিয়া কিন্নর।
মৃদঙ্গ-সমান তাহে তোমার নিনাদ,
সঙ্গীতের কোনো যাইবে না বাদ্।
অনন্তর উর্ধ্ব দিকে হইয়া উত্থিত
কৈলাস গিরির তুমি হইবে অতিথ।
যার প্রস্থ সমুদয় রাবণের বলে
ভাঙিয়া-খসিয়া সব রহে মূলস্থলে।
তুষারে অম্লান শোভে চূড়া শত-শত,
মুখ দেখে তদুপরি বিদ্যাধরী যত!
শোভা আর পাইতেছে শুভ্র হিমরাশি,
রাশীকৃত রহে যেন শঙ্করের হাসি।
তুষারে তোমার দেহ পাইবে প্রকাশ
বলরাম-স্কন্ধে যেন কালো-বর্ণ বাস।
কণ্ঠেতে শিবের হাত, সর্প এবে নাই,
পায়চালি করিবেন গৌরী হেন ঠাঁই।

সোপান-রূপেতে তুমি থাকিবে সামনে,
অন্তরের জলরাশি রাখিয়া দমনে।
বালার হীরায় তব অঙ্গে করি ক্ষত,
জল-যন্ত্র বিরচিবে দেবকন্যা যত।
জল দিতে তুমি যদি হও অনিচ্ছুক
গর্জন ছাড়িবে এক রাঙাইয়া মুখ।
অমনি খেলায় মত্ত দেবাঙ্গনা যত
অসঙ্গত পেয়ে ভয় হবে থত-মত।
ত্রিভুবনে নাহি স্থান কৈলাস-সমান,
নানা লীলা সহকারে কোরো অধিষ্ঠান।
মানস সরসী হতে কভু লবে জল,
ফুটিয়া আছয়ে যেথা সোনার কমল।
ঐরাবত-মুখে কভু হবে পট্টবাস,
কল্পতরু 'পরে কভু দিবেক বাতাস।
কৈলাস গিরির কোলে প্রণয়িনী-সমা
শোভয়ে অলকাপুরী, নাহিকো উপমা;
গঙ্গা তার পরূন-শাড়িব শোভা ধবে,
খসিয়া পড়েছে যেন সুখ-রসভরে।
তোমাসম জলধর কতই সেথায়
অপরূপ শোভাকরে হর্ম্যের মাথায়।
ফোঁটা-ফোঁটা ঝরে জল পলকে-পলকে,
মুকুতা ঝলকে যেন কামিনী-অলকে।

উত্তরমেঘ

অট্টালিকা কত-শত সাজিয়াছে তোমা-মতো,
দেখিবে হে গিয়া অলকায়;
তোমায় তড়িত মালা, সেথায় ললিত বালা,
তুল্য শোভে কিবা দুজনায়;
তোমার গর্জন স্বর শুনিতে কি মনোহর,
সেথায় মৃদঙ্গ বাজে তায়;
তোমার অন্তরে জল পরকাশে নিরমল,
মণিময় ভূতল সেথায়।

ইন্দ্রধনু তোমা-দেহে, অলকার গেহে-গেহে
চিত্রলেখা তেমনি প্রকাশ;
হর্ম্যগণ সুশোভন, উচ্চাকার আয়তন,
তোমা-মতো ছুঁয়েছে আকাশ।
আলো করি গৃহমাঝে বধূগণ কিবা সাজে,
কুসুমের অলঙ্কার গায়।
সেসব পড়িলে মনে, প্রাণ কাঁদে ক্ষণে-ক্ষণে,
কোথা ছিনু—এসেছি কোথায়!
পঙ্কজ তাদের করে, শিরীষ শ্রবণ পরে,
কুরুবক খোঁপায় বিলাসে;
কপোল-চুম্বন-লোভে, অলকেতে কুন্দ শোভে
কদম্ব বিরাজে কেশপাশে;
সদাই ফুটিছে ফুল, গুঞ্জিছে ভ্রমরকুল
ঋতুর শাসন সব টুটি;
হৃদয়েতে পেয়ে সুখ, যেন হাসি হাসি মুখ
কমলিনী সদা রহে ফুটি।
ময়ূর যতেক সবে, মত্ত হয়ে কেকারবে,
সদা আছে পাখনা তুলিয়া।
সদাই জ্যোৎস্নাজলে, স্নান করি কুতূহলে,
নিশা যায় আঁধার ভুলিয়া।
হর্ষ বিনা অশ্রুধারা, জানে না কেমন ধারা,
সেথায় যাহারা করে বাস।
যৌবনের নাহি শেষ, দুঃখের নাহিকো লেশ,
নাহি আর বিচ্ছেদ-হুতাশ।
অট্টালিকা-শিরোদেশে, উঠিয়া আনন্দ-বেশে,
সঙ্গে লয়ে বামা কতগুলি—
যুবকেরা মিলে বসি, সুরাপান রসে রসি,
মনের কপাট দেয় খুলি।
মন্দাকিনী-উপকূলে, পারিজাত তরুমূলে,
দেবকন্যা খেলিছে সকলে।
সুবর্ণ বালুকা দিয়া মণি-মুক্তা ঢাকা দিয়া,
খুঁজিবারে এ উহারে বলে।
প্রিয়ার বসন ধরি টান দেয় ত্বরা করি,
নাগর মনেতে পেয়ে সুখ,
মানিকের আলো দেখি, নিভাইতে গিয়া ঠেকি,
কামিনী লজ্জায় ঢাকে মুখ।

মেঘেরা কৌতুক-চিতে, জল দিয়া চিত্রাদিতে,
গৃহমধ্যে করিয়া প্রবেশ—
কেহ পাছে টের পায়, ভয় পেয়ে চলি যায়
ধূমের ধরিয়া ছদ্মবেশ।
প্রিয় আলিঙ্গন-ভরে, প্রাণান্ত হইয়া মরে,
কামিনীরা নিদাঘ-জ্বালায়।
চন্দ্রকান্ত মণিগণ, করে তাহা নিবারণ,
ফোঁটা-ফোঁটা জলের ছিটায়।
নিশীথে কামিনীগণ, যায় প্রিয়-নিকেতন,
চিহ্ন তার পাওয়া যায় প্রাতে;—
পথের মাঝেতে পড়ি মুক্তা যায় গড়াগড়ি,
ছিঁড়ে পড়ি স্তনের আঘাতে।
সাক্ষাৎ দেখিয়া হরে, কন্দর্প পারে না ডরে,
ধনুক লইতে হাতে তুলি।
ভুরু-ধনু দৃষ্টিসরে, তার কাজ সিদ্ধ করে,
নবীনা কামিনী যতগুলি।
কুবের-আলয় ছাড়ি উত্তরে আমার বাড়ি,
গিয়া তুমি দেখিবে সেথায়—
সম্মুখে বাহির দ্বার বাহার কে দেখে আর
ইন্দ্রধনু যেন শোভা পায়।
পার্শ্বে এক সরোবর, দেখা যায় মনোহর,
পদ্ম সনে অলি করে ঠাট।
তাহার একটি ধারে অপরূপ দেখিবারে
পরকাশে মণিবাঁধা ঘাট।
সরসীর স্বচ্ছ জলে, ভাসি-ভাসি দলে দলে,
হংস-হংসী ভ্রমে অবিশ্রামে।
যাইতে মানস সরে, করো না মানস সরে,
আছে তারা এমনি আরামে।
উঁচা ভূমি একধারে, গিরিসম দেখিবারে,
নীলকান্তি শিখরে বিরাজে।
সুবর্ণ কদলী দারু, চারিধারে শোভে চারু
তোমায় তড়িত যেন সাজে!
মাধবী মণ্ডপ 'পরে, কুরুবক শোভা করে,
ফুলগন্ধে ছুটি অলিকুল।
লতায়-পাতায় ঘেরা, আছয়ে সবার সেরা,
দুটি গাছ অশোক-বকুল

অশোক ভাবিছে মনে* পাব আমি কতক্ষণে,
বধূটির চরণ-আঘাত!
কবে আমি পাব মিঠা মুখমদিরার ছিটা
বকুল ভাবয়ে দিবারাত।
তাহার মাঝেতে আর ময়ূরের বসিবার
সোনার একটি আছে দাঁড়।
শিখী যথা কেকাভাষী, সন্ধ্যাকালে বসে আসি
আনন্দেতে উঁচা করি ঘাড়।
তাহারে নাচায প্রিয়া, করতালি দিয়া-দিয়া,
রণরণ বাজে তায় বালা।
স্মরিতে সেসব কথা, মরমে জনমে ব্যথা,
জ্বলি উঠে হৃদয়ের জ্বালা
এ-সকল নির্শনে, চিনিবে মুহূর্ত ক্ষণে,
দেখেমাত্র মোর বাড়ি-পানে।
এবে উহা শূন্যপ্রায়, কমল না শোভা পায়
কখনো দিবস অবসানে।
শীঘ্র যাইবার তরে ক্ষুদ্র করি কলেবরে
উপস্থিত হইবে সত্বর।
চপল চপলা ঝাঁকি, দৃষ্টি দিবে থাকি-থাকি
আলো করি ঘরের ভিতর।
প্রিয়ারে পাইবে দেখা, গা-ময় লাবণ্যরেখা,
পয়োধরে ফুলিছে যৌবন।
তনু তার কলেবর, কটি তার ক্ষীণতর
স্তনভার করয়ে বহন।
বাঁধিবারে অনুরাগ, অধরে বিম্বের রাগ,
মৃগ-আঁখি প্রণয়-আধার।
দেখিলে আকৃতি তার, মনে হয় সবাকার,
আদি সৃষ্টি বুঝি বা ধাতার।
অন্তরে বিরহ-ব্যথা দুই-একটি মুখে কথা,
দ্বিতীয় জীবন সে আমার।
দিন যত হয় গত, উৎকণ্ঠা চাপে তত,
যন্ত্রণার বাড়ে তত ভাব।
চক্রবাকী একাকিনী, কিংবা মৃদু মৃণালিনী,
যে রূপে পোহায় বিভাবরী,

পূর্বতন কবিদিগের কল্পনানুসারে অশোক তরু স্ত্রীলোকের পদাঘাতে পুষ্পিত হয় এবং বকুল বৃক্ষ উহাদিগের মুখমদিরার সংস্পর্শে কুসুমশালী হয়।

বিরহে হইয়া ক্ষীণ, যাপন করিছে দিন
প্রাণপ্রিয়া সেই রূপ করি।
কাঁদি-কাঁদি সারাক্ষণ, ফুলিয়াছে দু-নয়ন,
ওষ্ঠ-দুই আগুন নিশ্বাসে।
গালে আছে হাত দিয়া, পড়িয়াছে এলাইয়া,
কেশপাশ এপাশ-ওপাশে।
হয়তো দেখিবে গিয়া, পূজায় সে মন দিয়া
রহিয়াছে ব্যাকুল অন্তর ;
নয়তো বিরহভাব মনে করি আবির্ভাব,
লিখিছে আমার কলেবর।
নয়তো সারীরে কয়, "তারে কি লো মনে হয়,
তুই তো রসিকা বড় জানি ;
কাহুকে সে তোর মতো, বাসিত না ভালো অত,
সদাই শুনিত তোর বাণী।
কিংবা যে ক-মাস বাকি, ফুল ত-টি ভুঁয়ে রাখি,
দেখিতেছে গুনিয়া-গুনিয়া।
আমার সঙ্গমসুখে মনে আনি সকৌতুকে
কিংবা ঢালি দিয়া আছে হিয়া।
মলিন বসনোপরি, বীণাযন্ত্রে কোলে ধরি,
গাইতে যদ্যপি করে মন—
নেত্র জলে ভিজে তার, গাও না ক্রন্দন সার,
গলে আটকায় ক্ষণে-ক্ষণ।
কাজকর্মে দিনমানে, থাকে যদি সুস্থ প্রাণে,
রাত্রে তুমি গবাক্ষ-সামনে।
ভুঁয়ে যবে আছে শুয়ে, নিদ্রা নাই আঁখি-দুয়ে
খুলিবে যতেক আছে মনে।
ভূমিতলে পার্শ্বতল, অন্তরে বিরহানল,
কলেবর ভাবনায় ক্ষীণ।
পূর্বদিক সীমানায়, কলা অবসান-প্রায়,
শশী যেন আছয়ে নিলীন।
মনে মাতি মম-সনে, মুহু থাকে অন্যমনে
পরক্ষণে ছাড়য়ে নিশ্বাস।
যন্ত্রণার অশ্রু-জল, বহে যত অনর্গল
করে তত এপাশ-ওপাশ।
অমৃত শিশিরময় শশীর কিরণচয়
পড়িয়াছে বাতায়ন দিয়া,

পূর্ব্বকারে মনে করি দিয়া আঁখি তদুপরি,
পরক্ষণে আনে ফিরাইয়া।
অশ্রুযুত পক্ষ্মগণে ঢাকা পড়ে ক্ষণে-ক্ষণে
সুশোভন দুইটি নয়ন,
বরষার দিবাভাগে অর্ধমুদে অর্ধ জাগে
স্থলজাত নলিনী যেমন।
স্বপনে যদ্যপি কভু, পাই তারে বাঁচি তবু,
হেন ভাবি যত মুদে আঁখি,—
অশ্রুধারা অনিবার আটকে নিদ্রার দ্বার
শূন্যে উড়ে মনোরথ-পাখি।
অলঙ্কার পরিহার, পড়ে আছে শয্যোপরি,
দেখ যদি তার কলেবর—
দুঃখ না রাখিতে পারি, তোমারো হে অশ্রুবারি
ফেলিতে হইবে জলধর।
বলচি বলে এত করে, ভেবো না মোরে বাচাল
মনগড়া এতে কিছু নাই।
কহিতেছি যাহা-যাহা সমুদায় তুমি তাহা
স্বচক্ষে দেখিবে ওহে ভাই!
অপাঙ্গ অলকে ঢাকা, কাজল নাহিকো মাখা,
আঁখি এবে ঠারে না বিলাসে ;
তোমায় দেখিতে খালি উঠাইবে পক্ষ্মমালী,
পদ্ম যেন নড়িল বাতাসে।
দেখ যদি তুমি গিয়া, সুখে আছে ঘুমাইয়া,
খুলিও না গর্জ্জনের মুখ ;
স্বপনে পাইয়া মোরে বাঁধিয়াছে বাহুডোরে
ঘুচাইয়া দিও না সে সুখ।
বনের মালতী-জালে উঠাইয়া প্রাতঃকালে
সজল শীতলবায়ু দিয়া,
জাগাইবে প্রেয়সীরে, পরে তারে ধীরে-ধীরে
কহিবে কি—দিতেছি বলিয়া
এইরূপ তারে কবে, শুন ওহে অবিধবে,
সখা আমি স্বামী তোমার।
ভাসিয়া বায়ুর স্রোতে, তাহার নিকট হতে
আসিয়াছি লয়ে সমাচার।
জলধর জেনো মোরে, বিদেশে যে কেহ ঘোরে
গর্জ্জনে তাহারে তাড়া দিয়া,

উতলা অবলাটির পুঁছিবারে অশ্রুনীর
বাড়ি আমি আনি ফিরাইয়া।
এতেক শুনিয়া কানে, তাকাইয়া তোমা-পানে
হনুমানে জানকী যেমন
শুনিবে সকল কথা, মন নাহি আর কোথা,
বাক্যে যেন পাইছে জীবন।
এতেক বলিও শেষে, রামাচল পরদেশে,
সহচর আছয়ে তোমার ;
প্রাণে সে বাঁচিয়া আছে, জিজ্ঞাসিছে তোমা-কাছে,
তোমার কুশল সমাচার।
তোমা-অঙ্গে নিজ অঙ্গ, করিতেছে একসঙ্গ
মনোরথ-মাত্রে করি সার।
তপ্ত দেহ দুজনার, শ্বাস তাহে অনিবার,
দুধারে নয়ন বারি-ধার।
সখীদের সন্নিধানে, হেরি তব মুখপানে,
চুম্বিবারে হইয়া বিব্রত,
কত যেন কথা আছে, ফুসিত কানের কাছে,
তোমার সে এত অনুরত,—
এমন যে সেইজন, কেমনে বল এখন,
বাঁচিবে সে তোমার বিহনে!
শুন তুমি মন দিয়া, তোমায় সে মোরে দিয়া!
কি কহিছে সকাতর মনে।
হরিণে নয়ন তব, লতায় লালিত্য নব,
মুখশ্রী শশাঙ্কে শোভা পায় ;
তরঙ্গে আঁখির ঠার, শিখিপুচ্ছে কেশভার ;
এক ঠাঁই কিছু নাই হায়!
কোপ করি আছ যেন, প্রতিরূপ তোমা-হেন,
শিলাপরে লিখিয়া যতনে।
মোরে তব পদে ঠাঁই, যত আঁকিবারে যাই,
অশ্রু তত ঢাকে দু-নয়নে।
ঘুমাইয়া-ঘুমাইয়া, শূন্য ধরি জড়াইয়া,
স্বপনেতে পাইয়া তোমায় ;
বনের দেবতা যারা, এ সব দেখিয়া তারা,
অশ্রু ফেলে পাতায়-পাতায়।
দেবদারু দুলাইয়া, নানা পুষ্প বুলাইয়া
এই যে বহিছে সমীরণ,

তোমায় কখন যদি,　　　　ছুঁয়ে থাকে ক্ষণাবধি
তবে আমি করি আলিঙ্গন।
কেমনে এ পোড়া নিশি,　　　　পলকে যাইবে মিশি,
গ্রীষ্মতাপ থামিবে কেমনে ;
মিছা কেন মনস্কাম,　　　　উঠি-উঠি অবিশ্রাম,
হুতাশন জ্বালাইছে মনে।
দশাচক্র নহে স্থির,　　　　হেনমনে জানি স্থির,
কোনোমতে কাটাই জীবন ;
তুমিও হে দিনদিন,　　　　শরীর করো না ক্ষীণ,
ভাবিয়া-ভাবিয়া সাবাক্ষণ।
জাগিবেন বিষ্ণু যবে,　　　　শাপ মোর অন্ত হবে,
চক্ষু মুদি থাক এক মাস।
শরদের জ্যোৎস্না রাতে,　　　　মনসুখে একসাথে,
পরে মিটাইব যত আশ।
পতি তব মোর কাছে,　　　　যাহা-যাহা কহিয়াছে,
বলিলাম তোমায় সকলি ;
শুনিলে যে সমুদয়,　　　　না যদি প্রত্যয় হয়,
অভিজ্ঞান-বাক্য শুন বলি।
পড়িয়া সখার বুকে　　　　শুয়েছিলে মনসুখে,
ঘুমাইয়া পড়িলে অমনি ;
কি জানি কিসের লাগি,　　　　চমকি উঠিলে জাগি
ক্রন্দনের মতো করি ধ্বনি।
স্বামী তব জিজ্ঞাসিতে,　　　　বলিলে কৌতুক চিতে,
দেখিলাম ওহে ধূর্তরাজ।
যেন অন্য কারো সঙ্গে　　　　মাতি আছ রসরঙ্গে
ছি-ছি-ছি এমন তব কাজ!
এইরূপ শুনাইয়া　　　　কোনোমতে থামাইয়া
আসিবে আমার প্রেয়সীরে ;
প্রথম বিরহজ্বালা,　　　　এই সে জানিল বালা,
সহিবে কেমনে বল ধীরে।
নিরুত্তর আছে বলে,　　　　মোরে যে বিমুখ হলে,
এ-কথা কভু না আমি মানি,
চাতকে চাহিলে জল,　　　　কর তারে সু-শীতল,
নাও কোনো শব্দ মুখে আনি।
চাহিনু যা তব ঠাঁই,　　　　এমন চাহিতে নাই,
কি কবিব মারা যাই প্রাণে।

ঘুচাইতে কারো দুখ,		নহ তুমি পরাঙ্মুখ,
তোমায় সকল লোকে জানে।
সমাপিয়া মোর কাজ,		পরে ওহে ঘনরাজে ;
যথা ইচ্ছা তথা বিচরহ ;
বরষার শুভযোগে,		থাকো চপলার ভোগে,
ক্ষণেক না জানিয়া বিরহ।

সেরা মালি :

কবি বলিল :
বসন্তে কানন আজি কুসুমে কুসুম।
এ দুদিন কোকিলের চক্ষে নাহি ঘুম॥
কবিসখা বলিল :
আরে রাম! অবিরাম কুহু-কুহু-কুহু!
কৃপা করি ওহে পিক ক্ষান্ত হও মুহু!
শেষ রাত্রে পঞ্চম সপ্তমে যবে চড়ে,
শিয়রের গোড়ায় ডাকাত যেন পড়ে॥
কবি বলিল :
হু-হু শ্বাস ছাড়িল দক্ষিণ দিগ্‌বধূ।
কুহুস্বরে অমনি উত্তর দিল মধু॥
কবিসখা বলিল :
তোমার মধুর পায়ে করি আমি গড়।
ফুলকফি কাড়ি নিল গালে মারি চড়॥
বদলি দিলেন যাহা—কদলিরই ভাই—
বকুল আম্র-মুকুল ভস্ম আর ছাই!
কবি বলিল :
বকুল নয়ন-শূল কর্ণ-শূল পিক।
চেপেছে বিরহ-জ্বর—ভালো না গতিক!
কবিসখা বলিল :
কবিরাজ বটো কিন্তু নাড়ি-জ্ঞান নাই।
মোর কাছে বিরহের খাটে না বড়াই।
বিরহের পিতা যিনি (প্রেম যাঁর নাম)
দূর-হইতে মোরে তিনি করেন প্রণাম॥

কবি বলিল :
কবি যাতে ডুবি থাকে—রস অতি গাঢ়।
তাহা যদি ভঙ্গ কর, সঙ্গ মোর ছাড়ো॥
তোমার বচন-শেলে মর্মে পেয়ে ব্যথা,
মৃতপ্রায় কোকিলের ফুরিছে না কথা॥
মনেই রহিল তাহার মনের বারতা।
নৃত্য-গীতে ক্ষান্ত দিল নিকুঞ্জের লতা॥
কবিসখা বলিল :
ক্ষান্ত দিবে তুমিও আসিবে যবে জল।
ভরসা আমার এই ছাতাটা কেবল॥
করিয়া আইল মেঘ এ যে বিলক্ষণ।
চিকুর হানিছে অই! ভালো না লক্ষণ!
কবি বলিল :
জল আসে আসুক! মরিব আমি ভিজে।
আমার ব্যথায় ব্যথী ঋতুরাজ নিজে॥
চারু তরু-লতায় ফুটেছে চেকনাই।
তার পানে তোমার আদবে চোক নাই॥
যখন উঠিছে জাগি বাতাস দখিণে—
আসিছে বকুলগন্ধ! গাছ তো দেখিনে!
কবিসখা বলিল :
জেলের ছেলেটি যেথা ধরিতেছে মাছ ;
ঝিলের ওপারে ওই বকুলের গাছ॥
পাশের কুটিরখানি পড়ি নাই খালি।
কে যেন গাঁথিছে মালা ; বোধ করি মালি।
হিতবাক্য এ মোর করো না অবহেলা।
অই ঠাঁই চল যাই শীঘ্র এইবেলা॥
ভেবেছিনু বৃষ্টি হবে, ঠিক তাই হল।
পারো যদি ছাতাখানা টেনে টুনে খোলো॥
ততক্ষণ আমি গিয়া মালিরে শুধাই—
ঘরে যদি দুইদণ্ড দিতে পারে ঠাঁই॥

কবির বিপদ

পড়িল দু-এক ফোঁটা কবির মাথায়।
খোলে না যে ছাতাখানা, একি হল দায়।
দ্বিতীয়-তৃতীয় টানে খুলে গেল ছাতা।
ভিজিবার দায় থেকে বেঁচে গেল মাথা॥

ঘোর করি এল মেঘ শ্যামাইয়া তরু।
বাজিয়া উঠিল আর ভেকের ডমরু॥
ঝিলের ওপারে হেরি কুঁড়েঘরখানি,
কবিরে কবির মন করে টানাটানি॥
ঝিল সে বৃহৎ দিঘি সওয়া কোশ পাক্কা।
ঘুরিয়া যাইতে হলে দু-ঘণ্টা ধাক্কা॥
বাঁকিয়া হয়েছে পথ নয়নের আড়।
দ্বীপের করিছে ভান গাছে ঢাকা পড়ি॥
ক্ষণেক ফিনকি-ধারে নামিয়া নিস্তব্ধে,
আকাশ ভাঙিয়া পড়ে ঝুপঝাপ শব্দে॥
তুবড়িয়া যায় ছাতা বৃষ্টির থাবোড়ে।
ভুঁয়ে লপটায় কোঁচা হয়ে লড়্‌বোড়ে॥
গুটাইয়া ছাতাটা, আঁটিয়া মালকোঁচা॥
কোমর বাঁধিয়া কবি দৌড় দিল চোঁচা॥

আপদঃশান্তি

দৌড়াইয়া আসিছে কবি ছাতাটি বগলে।
সহাস্য-বদনে সখী দুয়ার আগলে॥
বলে কবি "বন্ধুর এমনি বটে কাজ!"
হাসে আর কাষ্টহাসি কষ্টে ঢাকি লাজ॥
চোকাট ডিঙাবে যেই, খাইল হোঁচট।
"আরে! আরে!" বলে সখা "লাগেনি তো চোট!"
পিছলিয়া পড়িতে-পড়িতে কবি বাঁচে।
হাসিতে নারিয়া সখা "হেঁচ্ছো!" করি হাঁচে
বলে আর "কবিত্বের রাম-শ্যাম কীট
জলে ভিজি এইবার হইয়াছে ঢিট!
মূর্তি যে হয়েছে তব কেমনে বাখানি!
বাসি হইলেই ফলে কাঙালের বাণী॥"
কবি বলে "ফলিবার হইলেই ফলে।
বাণীর পিতার লেখা বাণীতে না চলে॥
যা হোক—এখন আর চিন্তা নাই কোনো।
হস্তে ওটা কি তোমার গুটোনো-সুটোনো?"
সখা বলে "হস্তে মোব দেখিতেছ এ যা:—
জীবদ্দশায় ছিল ব্যাঘ্র মহাতেজা॥
মালির সহিত ছিল প্রণয় অত্যন্ত।
নিত্য খাওয়াইত মালি বরাহ জীবন্ত॥

পিঞ্জরের দ্বার খুলি মাঝে-মাঝে মালি
ডাকিত আদর করি "করালী! করালী!"
কোলাকুলি হইত আর স্যাঙাতে-স্যাঙাতে।
পিঞ্জরের দ্বার খুলি একদিন প্রাতে
অনেক ডাকিল মালি—না পাইল সাড়া।
ভাবিল 'বাঘার বুঝি লাগিয়াছে জাড়া'॥
গাত্র নাড়াচাড়া দিয়া দেখে শেষে মালি,
শরীর পিঞ্জরখানা হয়ে গেছে খালি॥
তেরাত্রি ত্যজিল মালি নয়নের বারি।
চর্মের হইল শেষে উত্তরাধিকারী॥
ভিজিয়া গিয়াছে ধুতি, ছাড়ো অতএব।
পরি এই বাঘছাল সাজো মহাদেব॥
বৃষ যদি চাও তবে পাদুকা ও-দুটি
হয়েছে জীয়ন্ত বৃষ, জলে ফুলি উঠি॥
পাঁজর বেরনো ছাতা ত্রিশূল মন্দ না।"
কবি বলে "অপূর্ব এ শিবের বন্দনা!
পাইলে লুফিয়া লইত অন্নদামঙ্গল।
পথে-হাটে ছড়ায়ো না রসের সম্বল॥"
এত বলি ব্যাঘ্রছাল কটিতে আঁটিয়া,
করিল কৈলাস-গিরি মালির খাটিয়া॥
চপলা চলিয়া গেল রাঙাইয়া চোক।
আরিম্ভল অমনি মেঘের ডাকডোক॥
তড়তড় শিলা পড়ি ছেয়ে ফেলে মহী।
গলা ছাড়ি ডাকে ভেক গোলাগুলি সহি॥
অদৃশ্য হইয়া গেল তৃণ-আস্তরণ॥
তবু ছাই জলধারা না মানে বারণ॥
চাহিয়া দেখিল কবি মালি নাই ঘরে॥
সখাবে শুধায় তাই "এ বৃষ্টি-বাদরে
ভিজিতে-ভিজিতে মালি গেল কোথা ভাই?"
সখা বলে "আমিও তো ভাবিতেছি তাই।
অই আসিতেছে মালি। পুঁটুলিতে কি ও!
তপ্ত মুড়ি এনেচ যে! শতবর্ষ জিও!"
উপস্থিত করে মালি চারিধামা মুড়ি।
লঙ্কা আর পাড়ি আনে গামছা দিয়া মুড়ি॥
ঝাঁঝালো সর্ষপ-তৈলে পুরি আনে ভাণ্ড।
কবি বলে "সর্বনাশ! করিছ কি কাণ্ড!

হাতির খোরাক এ যে! হরে-হরে-হরে।
এ দু-ধামা রাখো তুমি আপনার তরে॥"
এতবলি মুঠামুঠি মুড়ি করে পার।
চারিধামা হয়ে গেল নিমেষে উজাড়॥
পাতিয়া তখন মালি কলা-পত্র থালা ;
সাজাইয়া রাখে দুটা নারিকেল মালা।
আনিয়া ঘটিতে করি ক্ষণপরে মালি,
সেই দুই পাত্রে দিল গরম চা ঢালি॥
সে চা-র জনমভূমি ঝিলের ওধার।
মালঞ্চের মুখ ম্লান সুগন্ধে তাহার॥
চা চাখিয়া বলে, কবি, "জানো কি গো জাদু?
চা কোথাও পিই নাই এমন সুস্বাদু॥"
মালি বলে, "ক্ষমিবে সহস্র মোর দোষ।"
এত বলি লবঙ্গের দিয়া ঠেসঠোস
গুয়া-চুন খয়েরে তাম্বুল দিল সাজি।
কবি বলে, "বাকি কিছু রাখিলে না আজি॥
ছিলে নন্দনের মালি—সেবিতে বাসবে।
ক্ষীণ পুণ্য পুরাবারে এসেছ এ ভবে॥
সম্বল আঁটিয়া পুন যাবে সেই ঠাঁই।"
মালি বলে "কৃপায় স্বরগ হাতে পাই॥"
কবিরে বলিল সখা করি পরিহাস,
"লেগেছে মালির গায়ে তোমার বাতাস॥
বড্ড আজ ফাঁকতালে হাতাইল স্বর্গ!
হাতে যদি রজতের পড়িত বিসর্গ,
এই দণ্ডে হইত স্বর্গের পথরোধ।
একটু থেমেছে বৃষ্টি, হইতেছে বোধ॥
ভেকের গলার নাই শকতি সেরূপ।
এবার বুঝিবা হল একেবারে চুপ॥"
এই কথা যেইমাত্র মুহূর্তেক বলা—
সারা উদ্যানের ভেক ছাড়ি দিল গলা॥
মিনিট পনেরো-যোলো বৃষ্টি হল ঝেড়ে,
নরমিয়া ক্রমশ বাদল গেলে ছেড়ে॥
অবসান হয়ে এল বিদ্যুতের রেখা।
কোথায় যে গেল মেঘ নাহি তার দেখা॥
বৃষ্টি গেল ধরিয়া ফরসা হল দিক।
বৈকালি করিল শুরু নবরাগের পিক॥

পাদুকায় দিতে মালি আগুনের সেঁক।
চর্মের কুটুরি থেকে লম্ফ দিল ভেক॥
বেলা আছে দেখি মালি, অবসরবোধে,
ভিজে ধুতি ম্যালাইয়া টাঙাইল রোদে॥
মালির সৌজন্য হেরি কবির স্যাঙাত,
থাকিতে নারিল আর গুটাইয়া হাত॥
রেশমের রুমালের খুলিয়া পুঁটুলি
রুপার চারিটি চাকি ধীরে লয় তুলি॥
বলে আর মালিরে "কিঞ্চিৎ এই ধর"।
জোড়হাতে বলে মালি "এবে ক্ষমা কর॥
অধমজনের প্রতি না করিহ রোষ।
পদধূলিতেই মোর পরম সন্তোষ॥"
কবি বলে "অর্থ আগে বোঝো কথাটার।
প্রয়োজন হইয়াছে, আমা-দুজনার,
ভালো মালা দুই ছড়া, তারই অই মূল্য।
মালি বলে "নাহি ধন প্রসাদের তুল্য॥
প্রসাদ বিতরি লহ দাসের প্রণামি।
বহু যত্নে এ দু-ছড়া গাঁথিয়াছি আমি॥"
কবি বলে "আজিকে যা শিক্ষা লভিলাম—
স্মরণে রহিবে গাঁথা। লইনু ফুল-দাম॥
ফুল যাবে মার কোলে, না রহিবে আটকা।
স্মৃতির সুগন্ধ রবে চিরদিন টাটকা॥"
এত বলি উদ্যানের শান্তি করি ভোগ ;
গৃহে যাইবার কবি করিল উদ্যোগ॥
শুকাইয়া ধুতিখানা করে লটপট॥
কোঁচাইয়া ফেলিয়া পরিল চটপট॥
গোষ্ঠ-পথে চলা ভার শৃঙ্গীদের ভিড়ে।
লক্ষ্মী যায় চন্দ্রমায়, পক্ষী যায় নীড়ে॥
শীতল মলয় আনে ফুলের সুবাস।
সোজা চলে দুই সখা ছাড়ি আশপাশ॥
শাঁক-ঘণ্টা বাজিতেছে সন্ধ্যাদীপ জ্বলে।
দু-সখার মালা যায় দু-সখীর গলে॥

অন্তিম বাসনা :

অস্তাচলে গেল গো দিনমণি
আইল রজনী
উঠিল শশধর রজত-রুচি।
জীবনের সুখের দিন—হায়
এমনি চলিয়া যায়
রঙ্গভঙ্গ যায় চকিতে ঘুচি॥
ত্বরায় গো ফুরায় খুশি-হাসি—
পোড়া অদৃষ্ট আসি
অন্তিম যবনিকা ফেলিতে বলে।
খেলা-ধুলা সকলি অবসান—
বন্ধুজন-বয়ান
ভাসে গো অবিরাম নয়ন-জলে॥
ভাব এক এমনি—মরি হায়
কি যেন মৃদু বায়—
যাবে চলি আমার উপর দিয়া।
মনে হবে জীবনযাত্রা মোর
হইয়ে এল ভোর,
বিশ্রাম করিবারে চাহিবে হিয়া॥
প্রিয় বন্ধু সকল, তোমরা কি
কাঁদিবে পাশে থাকি
গেছি আমি এ দুখ প্রাণে না সয়ে?
তবে মোর আত্মা যে-আকাশে
যেখানে থাক্ না সে
কাঁদিবে তোমাদের দোসর হয়ে॥
তুমি ওহে ফেলিও একবিন্দু
অধিক নহে বন্ধু
একটি ফোঁটা শুধু নয়ন-লোর।
ফুল তুলি একটি প্রাণ-প্রিয়
মোর মাথায় দিও
সাধ মিটায়ে চেয়ো শয়নে মোর॥
পীরিতির সোহাগে ঢলঢল
সে তব অশ্রুজল
মোরে তা সঁপি দিতে কর না লাজ।
ত্রিভুবনে আছয়ে যত মণি
সবার সেরা গনি
রাখিবে করি তারে মাথার সাজ॥

বাসন্তী পদাবলী :

মধু ঋতু এল ধরণী-মাঝে।
হেলেদোলে লতা মোহন সাজে॥
অমৃত বরিষে মৃদু সমীর।
পরান লভয়ে মৃত শরীর॥
ঝুরু-ঝুরু-ঝুরু বহিছে বায়।
ঝরিয়া পড়িছে বকুল তায়॥
মধু-মালতীব ফুটিছে কলি।
চারিদিকে আর ঘুরিয়া অলি
গুনগুনায়িছে নব-রসিক।
পহরে-পহরে কুহরে পিক॥
ফুলের কে পায় কূল-কিনারা।
অগনন যেন গগন-তারা॥
তরো-তরো ফুল, রঙ-বেরঙ।
শতেক ফুলের শতেক ঢঙ॥
কেহ বা দোলে, কেহ বা ঝোলে,
কেহ বা মুখের ঘোমটা খোলে॥
কেহ বা ছড়ায় কণক-রেণু—
রাখাল যেথায় বাজায় বেণু॥
রাশি-রাশি ফুলে ভরিল সাজি।
ঘরে ফিরি চলো, আর না আজি॥

তেতালায় দুপুররাত্রি :

গভীর নিশীথ-মাঝে বাজে দ্বিপ্রহর।
শ্রমশান্তি সুধাপানে মজে চরাচর॥
নিশির উদার স্নেহে ঢালি দিয়া বুক।
ভুঞ্জিতেছে বসুমতী বিশ্রামের সুখ॥
শূন্যে করে তারাগণ জ্যোতির সঞ্চার।
গাছপালা ঝোপে-ঝাপে লুকায় আঁধার॥
কে কোথায় পড়ি আছে কোনো চিহ্ন নাই।
নিদ্রায় মগন সবে নিজ-নিজ ঠাঁই।

কীট-পতঙ্গের মাঝে খদ্যোত কেবল,
পঞ্চভূত-মাঝে বায় শিশির শীতল,
জীবের শরীরে আর নিশ্বাস পতন,
এই কয়ে যা আছে জীবের লক্ষণ॥

বরাহনগরের উদ্যানে :

নিশি অবসান-প্রায় সুখে সবে নিদ্রা যায়,
শয্যা কেহ ছাড়িতে না চাহে।
ঘা দিয়া হৃদয়-মাঝে মঙ্গল-আরতি বাজে,
বেণুধ্বনি কি মধুর তাহে॥
দ্বিজরাজ হেনবেলা বাহির হল একেলা
হর্ম্য হতে সুরম্য উদ্যানে।
নিঃশব্দ তরঙ্গবতী চলে গঙ্গা স্রোতস্বতী
ধীরে-ধীরে সাগরের পানে॥
শশী অস্ত যায়-যায় কি দুর্দশা হায়-হায়!
কেবা তার দুরবস্থা দেখে।
এমন যে বন্ধু তারা, স্বচ্ছন্দে এখন তারা
তারে ফেলে যায় একে-একে॥
স্নিগ্ধ অতি এই কাল নাহি কোনো গোলমাল
নিস্তব্ধ ব্রহ্মাণ্ড সমুদয়,
ঝোপ-ঝাপে অন্ধকার, নভস্তল পরিষ্কার
লতাপাতা হিমবিন্দুময়॥
পরপার যায় দেখা যেন এক চিত্রলেখা
পশ্চিম দিগন্তে নভসীব।
গাছে-গাছে একাকার, মাঝে-মাঝে রহে আর
দেবালয়-প্রাসাদ-কুটির॥
শাখাপত্র দুলাইয়া, জলপুঞ্জ ফুলাইয়া,
বুলাইয়া মাঠ-ময়দান,
মৃদুমন্দ বায়ু বহে মনে-মনে দ্বিজ কহে,
আহা কি সুন্দর এই স্থান॥

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম :

প্রথম অধ্যায়

ব্রহ্মবাদী শুনহ বাণী।
যাঁ হতে জনমে এ সব প্রাণী,
জনমি যাঁহাতে জীবন ধরে,
অন্তে যাঁহাতে গমন করে,
তাঁহারে জানিতে কর যতন।
তিনি ব্রহ্ম-সনাতন॥
আনন্দ হতে সকলি হয়েচে।
আনন্দে ধরি বাঁচিয়া রয়েচে॥
ধায় সবে আনন্দের প্রতি।
আনন্দের ক্রোড়ে লভে গতি॥
রসরূপ তিনি, সে রস পিয়া
আনন্দে ভাসে জীবের হিয়া॥
মনো সাথে যাঁরে না পেয়ে বাণী,
ফিরে আসে শেষে ক্ষান্ত মানি।
ব্রহ্মানন্দ, যে জানে সার,
ভয় নাই আর কিছুতে তার॥
আনন্দ যদি ব্যাপিয়া আকাশ
নাহি থাকিতেন স্বয়ংপ্রকাশ,
বাঁচিয়া রহিত কে তবে আজ—
চলিত-বলিত-কবিত কাজ?
সে যে আনন্দ—অমৃতসিন্ধু।
সব আনন্দ তাঁহারই বিন্দু॥
নাম-রূপ নাই—আধাব নাই।
বাক্য-মনের অগম ঠাঁই॥
তাঁরে যবে জীব ধরিয়া রয়,
তখন তাঁহার না থাকে ভয়॥
মনো-সাথে যাঁরে না পেয়ে বাণী,
ফিরে আসে শেষে ক্ষান্ত মানি ;
ব্রহ্মানন্দ যে জানে সার
ভয় নাহি হয় কদাপি তার॥

ইনিই জীবের পরম গতি।
পরম-ধন পরম-রতি॥
ইনিই জীবের পরম লোক
ইঁহারে হেরিলে না থাকে শোক।
ইহারি আনন্দসিন্ধু
ভুঞ্জে জীব বিন্দু-বিন্দু॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

না ছিল এ সব কিছু শুন শিষ্য প্রিয়।
ছিলেন কেবল সৎ এক অদ্বিতীয়॥
মহান আতমা তিনি জনমবিহীন।
জরা-মৃত্যু-ভয়-তাপ—কারো না অধীন॥
চিন্তা করিলেন তিনি ; চিন্তনের পিছু,
সৃজিলেন এইসব দেখিছ যা কিছু॥
তাঁহা হইতেই হল বিশ্বের প্রকাশ।
জনমিল প্রাণ-মন-ইন্দ্রিয়-আকাশ।
অনিল-সলিল-জ্যোতি-আশ্চরিজ তিনি!
জন্মিল পৃথিবী এই বিশ্বের ধারিণী॥
ভয়ে তাঁর জ্বলে অগ্নি, ভয়ে ভানু ভায়,
চলে মেঘ চলে বায়ু, ভয়ে মৃত্যু ধায়॥

তৃতীয় অধ্যায়

পরম তত্ত্বের সেই লভিবারে জ্ঞান
যাইবে গুরুর কাছে শিষ্য মতিমান॥
প্রশান্ত হৃদয়-মন প্রণত শিষ্যেরে
সত্য বলিবেন গুরু, বিনা ঘোর-ফেরে,
সেই ব্রহ্মবিদ্যা যাতে ব্রহ্মে যায় জানা,
ছাড়িয়া কল্পনা আর জলপনা নানা॥
ঋক্‌বেদ যর্জুবেদ, বাড়ায় কেবল খেদ,
সামবেদ তেমনি অথর্ব।

শিক্ষাকল্প সেথা অন্ধ নিরুক্ত জ্যোতিষ ছন্দ ;
ব্যাকরণ বৃথা করে গর্ব॥
অপরাবিদ্যা সকলি, পরবিদ্যা তাকে বলি
যাতে হয় নিত্য ধনলাভ।
পূর্ণব্রহ্ম অবিনাশী দেখা দেন হৃদে আসি
ঘুচাইয়া সকল অভাব॥
যাঁ হতে হয়েছে সৃষ্টি না যায় সেখানে দৃষ্টি,
কেহ তাঁরে নাহি পায় ধরা।
নাহি গোত্র নাহি বর্ণ, নাহি চক্ষু নাহি কর্ণ
সর্বত্র আছেন তিনি ভরা॥
হস্ত-পদ নাহি তাঁর, সূক্ষ্ম বিভু সারাৎসার
চরাচর বিশ্বের কারণ।
হ্রাসবৃদ্ধি নাই অণু, হেরে লোমাঞ্চিত তনু
তদগত চিত্ত তপোধন।
দেব দেব পূজ্যতম! ইঁহাকেই করে নম
ব্রাহ্মণেরা, গার্গি, বারবার।
স্থূল-সূক্ষ্ম ছোটো-বড়ো, যাহা কিছু মনে গড়ো
নন ইনি কিছুই তাহার॥
রাঙা-কালো-তমোছায়
চক্ষে যাহা কিছু ভায়
নন তাহা নিখিলের প্রভু।
জলের মতন নন
নন তিনি সমীরণ
আকাশ নহেন তিনি কভু॥
সঙ্গে তাঁর নাহি কেহ,
নাহি দেহ নাহি গেহ,
চক্ষু-মুখ-কর্ণ নাহি তাঁর।
বাক্য-মন-তেজঃ-প্রাণ
তাঁহাতে না পায় স্থান,
ব্রহ্ম তিনি অগম্য, অপার॥
ইঁহারই শাসনে গার্গি-সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ
আপন-আপন পথে ধায় অহরহ॥
উপরে দ্যুলোক আর নিচে ধরাতল
ইঁহারি শাসনবলে রয়েছে অটল॥
মুহূর্ত-দিবস-রাত্রি-মাস-পক্ষ চলে।
চলে ঋতু-সম্বৎসর শাসনের বলে॥

তুষার-মণ্ডিত শ্বেত-পর্বত হইতে
ইঁহারি শাসনে, গার্গি, নাবিয়া ত্বরিতে
পূর্বমুখে বহি চলে শত নদনদী,
অন্যে আর অনুসরে পশ্চিম জলধি॥
ইঁহারে না জানি যারা, যত বীজ বপে,
যজ্ঞে, যজ্ঞ জুহে হোম, তপো তার তপে,
বহুবর্ষ ধরি করে যত অনুষ্ঠান,
কালের কবলে হয় সব অবসান॥
ইঁহারে না জানি যারা হেথা হইতে যায়
কি দুর্দশা তা সবায় কি কহিব হায়।
অবিনাশী ব্রহ্মে জানি যেই ভাগ্যবান
হেতা হইতে পুণ্যলোক করয়ে প্রয়াণ
সেই ধন্য সেই ধন্য! তিনিই ব্রাহ্মণ!
বলিনু তোমারে গার্গি সত্য এ বচন॥
অক্ষর পুরুষ ব্রহ্ম দৃষ্টির নহেন গম্য
কিন্তু তিনি নিস্তব্ধ
নাহি তাঁর সাড়াশব্দ,
শুনেন যা কিছু মোরা বলি॥
তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব
নাহি জানে দেব মর্ত্য,
সকলি জানেন জ্ঞাতা সেই
বস্ত্র-বুনানির মতো
রহিয়াছে ওতোপ্রোতো
অসীম আকাশ তাহাতেই॥
ইহার ভয়ে পবন বহে।
তপন উঠে ইহাঁর ভয়ে।
ইহাঁর ভয়ে অলন জ্বলে।
গগনপথে জলদ চলে॥
আজ্ঞাকারী যেন ভৃত্য
মৃত্যু করে নিজ কৃত্য॥
সকলে প্রধান ইনি ; যা কিছু যেথায়
সেই প্রাণে করি ভর স্ব-স্ব কাজে ধায় ;
সবাই করিছে তাঁহার কাজ।
মহদ্ভয় তিনি উদ্যত বাজ॥
জানেন যারা ইহার তত্ত্ব
লভেন তাঁরা অমরত্ব॥

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রবণের শ্রবণ তিনি, মনের তিনি মন
বচনের বচন তিনি জীবনের জীবন ॥
মনের অন্তরে মন, মন নাহি পায়।
বচন না যায় সেথা নয়ন না যায় ॥
জানি না আমরা তাঁরে ; না জানি সন্ধান
কেমনে করিতে হয় তাঁহার বাখান ॥
যে যতই জানে তারে, তাহা নন ঠিক।
কেহ যাহা নাহি জানে তাহারো অধিক ॥
পূর্বতন ঋষিদের এইরূপ বাণী—
আমা-সবাকারে যাঁরা কহিলা বাখানি ॥
বাক্য যা কহিতে গিয়া না পারে কহিতে
বাক্যেরে জাগান যিনি অন্তর হইতে
তাঁহারেই ব্রহ্ম জেনো ; বলি "ব্রহ্ম ইনি"
লোকে যাহা উপাসয়ে, তাহা নন তিনি ॥
মন যাঁরে কিছুতেই ভাবিয়া না পায়,
মনের সমস্ত ভাব যার চক্ষে ভায়,
তাহাকেই ব্রহ্ম জেনো ; 'ইনি ব্রহ্ম বলি"
লোকে যাহা উপাসয়ে, অলীক সকলি ॥
মনে যদি কর তাঁরে জানি সমুচিত,
অল্পই তাঁহারে জানো কহিনু নিশ্চিত ॥
মনে নাহি করি আমি কদাপি এরূপ,
সমুচিত জানিয়াছি তাঁহার স্বরূপ ॥
জানি না যে তাও নয়, জানি তাও নয়।
এ তত্ত্বটি জানিলে তবে সে জানা হয় ॥
যে-জন ভাবিয়া না পায় অন্ত
তাঁহারি ধেয়ানে তিনি জীবন্ত ॥
ভাবিয়া যে তাঁর পেয়েছে পার,
তাহার কেবল ভাবনা সার ॥
যে বুঝে উত্তম রূপে,
হাতড়ায় অন্ধকূপে ॥
বুঝিতে যে নাহি পারে,
চিনিয়াছে সেই তাঁরে ॥
এ ভব আঁধারে, জানিল যে তাঁরে
লভিল সে নিস্তার।

না জানিল যদি, নাহি রে অবধি
তাঁহার দুর্দশার॥
জীবে জীবে ধীর, মন করি স্থির,
তাঁহারে করিয়া ধ্যান,
মত্যলোক ছাড়ি, মৃত্যু ফেলে ঝাড়ি
অমৃত করিয়া পান॥

পঞ্চম অধ্যায়

জগৎ সংসার মাঝে যা কিছু যেথায়
সমস্ত করিছে বাস ঈশের ছায়ায়॥
তিনি যাহা দিয়াছেন কর তাহা ভোগ।
পরধনে লোভ করি বাড়ায়ো না রোগ॥
স্থির তিনি এক জগৎ স্বামী
অথচ মনের অগ্রগামী॥
ইন্দ্রিয়-মন যে যত ধায়,
কেহ না তাঁহারে নাগাল পায়॥
স্ব-স্থানে থাকে বিরাজমান
দ্রুতগামী সবে ছাড়ায়ে যান॥
অচল-অটল সেই ব্রহ্মে করি ভর,
প্রাণীদের প্রাণবায়ু বহে নিরন্তর॥
করেন নিখিল-কার্য ত্রিভুবননাথ,
অথচ না দেন তিনি কোনো কাজে হাত।
দূরে তিনি, কাছে তিনি আঁখির গোচরে।
অন্তরে-বাহিরে তিনি সর্ব চরাচরে॥
সর্বভূত দেখে যেই পরম আত্মায়,
পরমাত্মা সর্বভূতে, কিছু না লুকায়।
সমস্ত আছেন ব্যাপি শুভ্র সারাৎসার।
নাহি শিরা নাহি ব্রণ নাহি দেহ তার॥
শুদ্ধ তিনি নিরঞ্জন, নাহি পাপ-লেশ।
মনের নিয়ন্তা, কবি, স্বয়ম্ভু মহেশ॥
অগণন প্রজাতন্ত্র নিত্য বহমান—
সবার করেন তিনি ব্যবস্থা বিধান॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

চিত্ত করি সমাধান একাগ্রতা-সহ,
পরম-পুরুষ ব্রহ্মে জানিতে ইচ্ছহ॥
ব্রহ্মে যেই জানে সেই নিত্যধন লভে,
যাহার সদৃশ আর কিছু নাই ভবে॥
আছেন পরম-ব্যোমে ব্রহ্ম সে অনন্ত।
সত্য তিনি, জ্ঞান তিনি, জাগ্রত জীবন্ত।
তাহারে যে-জন জানে করিয়া সাধনা,
ভুঞ্জয়ে তাঁহার সাথে সমস্ত কামনা॥
যাঁহার জ্ঞানের নাই কোন ঠাঁই-সীমা ;
ভূলোক-দ্যুলোক মাঝে যাঁহার মহিমা ;
তাঁহারে, জানিয়া ধীর, হেরে অদ্বিতীয়
আনন্দ অমৃত রূপ অনির্বচনীয়॥
বিরজ নিষ্কল ব্রহ্ম হিরণ্যগুহায়
কি যে সে জ্যোতির জ্যোতি অকলঙ্ক ভায়—
যত যেথাকার জ্যোতি সবে হারি মানে।
আত্মারে যে জানিয়াছে সেই তাহা জানে॥
না ভায় সেখানে সূর্য, না চন্দ্র, না তারা।
না ভায় চপলা সেথা, চমৎকারাকারা॥
কোথা লাগে অগ্নি! তারি প্রকাশের পিছু
প্রকাশিছে সমস্ত যেখানে যাহা কিছু॥
নিখিল-জগৎ আলো তাঁহারি জ্যোতিতে ;
প্রকাশেন, প্রাণ ইনি ; সবার সহিতে॥
জানে যে, সে রহে তাঁর প্রেমে নিমগন।
কহে না একটি কোন বিরুদ্ধ বচন॥
আত্মাতে যাঁহার কেলি, আত্মাতেই রতি ;
কর্তব্য-সাধনে যিনি নিরন্তর ব্রতী ;
যিনি জ্ঞানী, যিনি প্রেমী, যিনি ক্রিয়াবান্,
ব্রহ্মজ্ঞ ধীরের মাঝে তিনিই প্রধান॥
জ্যোতির্ময় রূপ তাঁর অচিন্ত্য মহান্।
সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, কে পায় সন্ধান॥
দূর হইতে দূরে তিনি ছাড়ায়ে আকাশ।
দেখে যে, তাহার তিনি অন্তরে প্রকাশ॥
চক্ষু নাহি যায়, সেথা বাক্য না জোগায়।
কোন ইন্দ্রিয়েই তাঁরে পাওয়া নাহি যায়॥
বিশুদ্ধ যাঁহার মন জ্ঞানের প্রভায়,
ধ্যান ধরি সেই তাঁরে দেখিবারে পায়॥

সপ্তম অধ্যায়

ঈশ্বরগণের তিনি পরম ঈশ্বর।
দেবতার দেবতা পরম পরাৎপর॥
সকল পতির পতি একমাত্র সেই।
আরাধ্য দেবতা তিনি, জানি মোরা এই॥
ইন্দ্রিয় তাঁহার নাই নাহি তাঁর দেহ।
সমান বা অধিক নাহিকো তাঁর কেহ॥
মহতী শকতি তাঁর, বিচিত্র বিভব।
জ্ঞান-ক্রিয়া বল-ক্রিয়া অযত্ন-সুলভ॥

নাহি পিতা নাহি পতি নাহি তাঁর অধিপতি
নাহি কোন অবয়ব চিহ্ন।
নিখিল ভব-সংসার আশ্চর্য রচনা তাঁর ;
কারণ কে আর তিনি ভিন্ন॥
কাহারো নহেন বশে, চালান ইন্দ্রিয়-দশে,
নিবসেন হৃদয়ে সদাই
সাধিয়া একাগ্র মনে, তাঁহারে যাঁহারা জানে
তাঁহাদের মৃত্যু কভু নাই॥
গভীর গুহায় লীন, দরশন সুকঠিন
আদি-দেব, তাঁহারে যে ভজে—
লভিয়া অধ্যাত্ম-যোগ, করয়ে আনন্দ-ভোগ,
হর্ষ-শোক এড়ায় সহজে॥
যে জানে মনের মন, নয়নের নয়ন,
শ্রবণের শ্রবণ, প্রাণের প্রাণ ;
জানিয়াছে, সেইজন, ব্রহ্ম-সনাতন,
আদি-দেবতা সেই বিভু মহান॥
প্রতিমা তাঁহার নাই কোথাও কোনো ঠাই
জ্ঞানের একই কথা জানিবে শুভ ;
নানা কহে নানা লোকে, প্রকাশে জ্ঞানালোকে
বিরজ অজ আত্মা মহান ধ্রুব॥
অহোরাত্রে করি ভর, নিখিল-সম্বৎসর,
করে নিরন্তর প্রদক্ষিণ॥
তিনি জ্যোতি, তিনি জ্ঞান, অমৃত, সাক্ষাৎ-প্রাণ!
পূজয়ে দেবগণ তন্দ্রাহীন॥
নিখিল ভুবন-তিন, তাঁহার নিয়মাধীন ;
সর্বজগতের অধিপতি।

সাধু হলে ব্যবহার বাড়ে না কিছুই তাঁর
অসাধুতে নাহি তাঁর ক্ষতি॥
সকলের অধীশ্বর পালিছেন চরাচর
লোকে সঙ্ঘ যতেক নিখিলে—
সব হত ছিন্নভিন্ন, থাকিত না কোনো চিহ্ন,
তিনি সে না ধরিয়া থাকিলে॥
প্রাণ-মন সব-সাথে, রয়েছে ইহার হাতে,
অন্তরীক্ষ দ্যুলোক অবনী।
ইঁহাকেই জানো সার, ছাড়ো বাক্য আর-আর,
ইঁনি মাত্র অমৃতের খনি॥

জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, সর্বজ্ঞ চেতন
কোথা হইতে কে যেন—এমন কেহ নন॥
সূক্ষ্ম তিনি জ্যোতির্ময়, তাঁহে কবি ভর
বর্ত্তিছে নিয়ত এই বিশ্বচরাচর॥
তিনি সত্য ; তিনি অমৃত ; শর-সম—
বসাও তাঁহাতে মন, প্রিয়-শিষ্য মম॥
ধনু ওঁ ; শর আত্মা—আছে তব ঠাঁই।
লক্ষ্য সেই ব্রহ্ম ; তাঁরে বিদ্ধ করা চাই॥
না হেলি, না টলি, মন করি একাগ্র,
নিবাত-নিষ্কম্প যেন দীপের শিখাগ্র,
সন্ধান করিবে আত্মা পরম আত্মায়,
তন্ময় হইয়া যাবে তখন সে তাঁয়।
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সমভূমি ঠাঁই।
বালুকা-কঙ্কর কিম্বা অগ্নি যেথা নাই।
বিহঙ্গ-কূজিত বৃক্ষ সুশীতল-চ্ছায়।
জলাশয় সম্মুখে, ওপার দেখা যায়॥
ত্রিসীমায় নাহি কোন নয়নের জ্বালা।
সুবায়ু-সেবিত গুহা নিভৃত-নিরালা॥
দেখি লয়ে হেন এক মনোমত স্থান।
ব্রহ্মে করিবে সাধক আত্ম-সমাধান॥

উন্নত করি বক্ষ-শির
শরীর করিয়া ঋজু-স্থির ;
বাহির হইতে আনিয়া ডাকি,
ইন্দ্রিয়-মন-হৃদয়ে রাখি ;
ব্রহ্ম-ভেলায় করিয়া ভর
তরিবে সাগর ভয়ঙ্কর॥

অষ্টম অধ্যায়

সর্বদিকে চক্ষু তাঁর, সর্বত আনন।
সর্বদিকে বাহু তাঁর সর্বত চরণ॥
পক্ষি-দেহে দিলা পক্ষ, নর-দেহে হস্ত।
রচিলা দ্যুলোক মহী একাকী সমস্ত॥
সর্বত চরণ-হস্ত, নিখিল-কাজে ব্যস্ত,
    সর্বত শিরোমুখ, সর্বত কান।
চরাচর সমুদায়, ব্যাপিয়া মহিমায়
    আপনি আপনায় বিরাজমান॥
নিখিল মুখ-মস্তক মিলিয়াছে তাঁয়।
সর্বহৃদে নিবসেন, নিভৃত গুহায়॥
সর্বব্যাপী সর্বগত সে যে ভগবান্।
মহান অপরিসীম, মঙ্গল-নিধান॥
হস্ত তাঁর নাই কিন্তু করেন গ্রহণ।
পদ নাই—করেন সর্বত্র বিচরণ।
চক্ষু নাই—দেখেন সমস্ত আগু-পিছু।
কর্ণ নাই, শোনেন—যে কহে যা কিছু॥
পূর্বতন ঋষিগণ বলেছেন তাই—
মহান্ পুরুষ তিনি তুল্য তাঁর নাই॥
প্রসুপ্ত-মাঝে, একাকী, যিনি জাগিয়া থাকি
    গঠেন নিতি-নিতি যার যা চাই ;
ব্রহ্ম তিনি সারাৎসার, সরব-মূলাধার,
    তাঁরে ডিঙায় কারো সাধ্য নাই॥
আশ্চর্য তাঁহার ভাব নাহি যায় কহা।
অণু হইতেও অণু মহা হইতে মহা॥
নিবসেন হৃদি-মাঝে নিভৃত গুহায়।
কর্মফল, ভোগ-স্পৃহা, পরশে না তাঁয়॥
দেখে যে সে পরাৎপরে, দেখে যে মহিমা,
তার আনন্দের নাই সীমা-পরিসীমা॥
আলোক দেখিয়া তার খুলি যায় চোক।
হৃদয়-মাঝারে আর নাহি রহে শোক॥
এক তিনি অন্তরাত্মা বশী সবকার।
এক হইতে হইতেছে অসংখ্য ব্যাপার॥
আত্মাতে যে দেখে তারে সঁপিয়া হৃদয়,
তাহারি শাশ্বত সুখ, অন্যের তা নয়॥

অনিত্য সংসার-মাঝে এক তিনি নিত্য।
তাঁহারি চেতনে চেতে জগজন-চিত্ত॥
একাকী দেখেন তিনি যাহার যা চাই।
বিধান করেন আর সেই অনুযায়ী॥
আত্মাতে যে দেখে তাঁরে সঁপিয়া হৃদয়,
তাঁহারি শাশ্বত শান্তি অন্যের তা নয়॥
হৃদয়ের গাঁট হলে ভেঙে চুরমার,
মর্ত্য সে অমর হয় কহিলাম সার॥

নবম অধ্যায়

ভর করি একই শাখী, সুন্দর দুটি পাখি,
দোহে দোঁহার সখা ভবের ক্ষেত্রে।
সুখে হয়ে ঢল-ঢল, একটি খায় ফল ;
আরেকটি না খাইয়া নিরখে নেত্রে॥
প্রভু আছে একই গাছে, তারে না দেখি কাছে
কাঁদয়ে জীব-পাখি বারম্বার।
প্রভুরে স্বমহিমায়, যবে দেখিতে পায়,
আনন্দ নাহি ধরে তখন তার॥
নবোদিত যেন রবি, হিরন্ময় ছবি
দেখে যে হৃদয়কাশে নয়ন মেলি।
শোক নাহি করে আর, লভয়ে নিস্তার,
নিখিলপুন্য পাপ ঝাড়িয়া ফেলি॥
নিরঞ্জন অলোহিত, শরীর-বিরহিত,
নিত্য পরাৎপরে জানে যে-জন।
পৃথিবীর ধূলিরাশি ঝাড়িয়া ফেলে হাসি,
লভিয়া অবিনাশ পরম-ধন॥
নয়নে না ভায় রূপ, বচন হয় চুপ,
ভাবনা নাহি পায় চিহ্ন তাঁর।
আত্মাতে দেখাই শর, ভবের কর্ণধার
শান্ত শিব অদ্বিতীয় সারাৎসার।
পুত্র হতে প্রিয় ইনি বিত্ত হতে প্রিয়!
নিখিল ভব-সংসারে যত রমণীয়
যা কিছু, সকল হতে ইনি প্রিয়তম—
এই যে অন্তরতম আত্মা অনুপম॥

অন্যে যদি প্রিয় বল, সে প্রিয় তোমার
রহিবেন চিরদিন, কহিলাম সার॥
আত্মাকে উপাসিবে প্রিয় বলি জানি
তোমার প্রিয়ের তবে হইবে না হানি॥
আতমারে দেখা চাই বিশ্বে মেলি আঁখি।
শোনা চাই গুরুর বচনে শ্রদ্ধা রাখি॥
মনোমাঝে ভাবা চাই তারে অহরহ।
ধ্যান করা চাই তাঁরে একগ্রতা-সহ॥
এই সে আত্মা করেন সর্বত্র বিরাজ,
সকলের অধিপতি রাজ-অধিরাজ॥
চক্রের নাভিতে আর বেষ্টন-বলয়ে,
অরাবলি রহে যথা অটল-আশ্রয়ে,
তেমনি যতেক জীব, যত বৃক্ষলতা,
যত লোক-লোকান্তর, যতেক দেবতা,
পরমাত্মা আর তাঁর নিয়মের বলে
রহিয়াছে যথাস্থানে, তিলেক না টলে॥
চিরন্তন [illegible] তিনি আমা-সবাকার,
পুন-পুন তাঁরে আমি করি নমস্কার॥
হে অনাদি! ব্যাপি আছ নিখিল-গগন।
তোমা হইতে হইয়াছে, সমস্ত ভুবন॥
জেনেছি তাঁহারে এই মর্ত্যে করি বাস।
না জানিলে হইত কী মহান বিনাশ।
ইঁহারে যে জানে, লভে অনন্ত জীবন।
দুঃখ কেবল পিয়ে অন্য যতজন॥
সকল হইতে উচ্চ সকলের আদি
নাহি রূপ নাহি শোক নাহি তাঁর ব্যাধি॥
ইঁহারে যে জানে, লভে অনন্ত জীবন।
দুঃখই কেবল পিয়ে অন্য যতজন॥
বৃহৎ সবার উচ্চ , ব্রহ্ম একমাত্র।
নিবসেন সর্বভূতে যে যেমন পাত্র॥
আছেন বেষ্টন করি জগৎ-সংসার।
তাঁহারে যে-জন জানে মৃত্যু নাহি তার॥
যতেক ইন্দ্রিয় আর যাহার যে গুণ ;
সবার ভিতরে জাগে তাঁহার আগুন।
সকলের প্রভু তিনি ইন্দ্রিয়-রহিত।
সবার শরণ তিনি সবার সুহৃৎ॥
অখণ্ড অব্যয় জ্যোতি পূর্ণপরাৎপর।
শান্তির নিদান তিনি ধর্মের আকর॥

দশম অধ্যায়

ওঁ বলিতে বুঝায়—ব্রহ্ম যিনি সর্ব-মূলাধার
অগণন দেবতা ইঁহারে দেয় পূজা-উপহার॥
মধ্যে সেই দেব-দেব, ত্রিভুবনে মহিমা না ধরে।
উপাসিছে সকল দেবতা তারে প্রেম-ভক্তিভরে॥
ওঁ বলি ধ্যান ধরি পরম আত্মার,
কুশলে তরিয়া যাও ঘোর-অন্ধকার॥
ওঙ্কার সাধিয়া জ্ঞানী লভে সেই শান্তির সাগর
অজর অমর ব্রহ্ম অভয় পরম-পরাৎপর॥
সেই সবিতার বরণীয় তেজ জ্ঞান শক্তিময়—
সেই দেবতার সুমঙ্গল জ্যোতি অমৃত-নিলয়—
ধ্যান করি ; ঘুচাইয়া যিনি হৃদয়ের অন্ধকার
বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরিছেন অহরহ আমাসবাকার॥

ব্রহ্মে আমি ত্যজিব না
আমারে ত্যজেন নাই প্রভু।
তাঁহারে ত্যজিব আমি—
এমন না হয় যেন কভু॥

পরম-পুরুষ তিনি জানিবার বস্তু, জানো তাঁরে।
মৃত্যু, ব্যথা না দিক্ তোমা-সবারে, এ ঘোর-সংসারে।
যে দেবতা জলে, যিনি দীপ্ত হুতাসনে ;
প্রবিষ্ট আছেন যিনি, সমস্ত ভুবনে॥
যে দেব অশ্বত্থ-বটে, ধান্যে-তৃণে আর ;
বারবার তাঁরে আমি করি নমস্কার॥

একাদশ অধ্যায়

শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ নাহি তাঁর।
অক্ষয়-অনাদি-নিত্য অনন্ত-অপার॥
মহতের মহৎ অচল-সম স্থির।
এড়ায় মৃত্যুর মুখ তাঁরে জানি ধীর॥
সবার অন্তরে তিনি আছেন নিগূঢ়।
দেখিতে না পায় তাঁরে জ্ঞান-হীন মূঢ়॥

সূক্ষ্মদর্শী সাধকের সুগভীর জ্ঞানে
দেখা দেন যবে তিনি, সেই তাঁরে জানে॥
ভালো-ভালো কথা কেবল হাওয়া।
তাহাতে তাঁহারে না যায় পাওয়া॥
থাকিলে কি হয় ধারালো মেধা।
তাহাতে না যায় লক্ষ্য বেঁধা॥
অনেক কয়েছে অনেক মুনি॥
পাওয়া নাহি যায় শ্রবণে শুনি॥
ব্যাকুল হৃদয়ে যে তাঁরে চায়,
তাঁহারি কৃপায় তাঁহারে পায়॥
আর সব কথা হইলে চুপ,
প্রকাশেন তিনি আপন রূপ॥
ওঠো। জাগো! উত্তম আচার্যে ধর গিয়া—
লভ জ্ঞান, অরে! মোহনিদ্রা তেয়াগিয়া॥
বলেন সাধক যাঁরা সিদ্ধ-মনোরথ,
ক্ষুরের ধারের মতো দুর্গম সে পথ॥
এই সে অনাদি ব্রহ্ম অমৃত-অভয়।
ইঁহারে প্রশান্ত মনে উপাসিতে হয়॥

দ্বাদশ অধ্যায়

বৃক্ষের মতন স্তব্ধ রয়েছেন শূন্যের উপরে।
নিখিল-ভুবন পূর্ণ সেই এক মহান ঈশ্বরে॥
বাস-বৃক্ষে যেমন বিহঙ্গকুল, শুন প্রিয় শিষ্য,
তেমনি পরম আত্মাতে করে ভর—চরাচর বিশ্ব॥
এক দেব গূঢ় তিনি সকল বস্তুতে।
অন্তরাত্মা বিভু নিবসেন সর্বভূতে॥
চক্ষের উপরে তাঁর রয়েছে সমস্ত।
যেথায় যা কিছু হয়—সবে তাঁর হস্ত॥
ব্যাপিয়া আছেন তিনি নিখিল-ভুবন।
নিগুণ-নিঃসঙ্গ তিনি জাগ্রত-চেতন॥
আলো করি দশদিক্ সহস্র কিরণে,
প্রকাশে যেমন ভানু গগণ প্রাঙ্গণে,

উজলিয়া সমস্ত, তেমনি ভগবান্
প্রকৃতির মাঝারে করেন অধিষ্ঠান॥
উঠুক বা মহাব্যোমে হইয়া উধাও,
ছুটুক বা পার্শ্বাবাগে, মধ্যে বা কোথাও,
কোনো ঠাই মন তার নাহি পায় সীমা।
নাম তাঁর মহদ্‌যশ, নাহিকো প্রতিমা॥
রূপ নাহি ভায় দরশ-ক্ষেত্রে
কেমনে তাঁহারে দেখিবে নেত্রে!
সংযত করি মনঃ-প্রাণ
জানে যে তাঁহারে শ্রদ্ধাবান,,
ঝাড়িয়া ফেলিয়া দুঃখ-শোকে
অমর সে হয় মর্ত্যলোকে॥
অনেকে তাঁহার কথা শুনিতে না পায়।
শুনিয়াও অনেকে জানে না তাঁরে হায়॥
আশ্চর্য সে, তাঁর কথা কহিতে যে পারে।
নিপুণ সে অতিশয়—লভে যে তাঁহারে॥
আশ্চর্য তাঁহার জ্ঞাতা ; শিক্ষা লভিয়াছে
কী না জানি সুনিপুণ আচার্যের কাছে।
মূঢ়মতি যতসব, বালকের-প্রায়,
বিষয়-মৃগতৃষ্ণার পাছু-পাছু ধায়॥
চারিদিকে মৃত্যুপাশ ভয়ঙ্কর অতি,
তাহা তারা নাহি জানে—পড়ি যায় তথি॥
অমৃত যে কি বস্তু—জানিয়া ধীর-সবে,
নিত্যের না করে আশ অনিত্য এ ভবে॥
অমর না হই যাতে কি করিব তাতে।
তেঁই ডাকিতেছি আমি ত্রিভুবন-নাথে॥
অসৎ হইতে মোরে লয়ে যাও সতে।
আলোকে লইয়া যাও অন্ধকার হতে॥
মৃত্যু হতে আমায় অমৃতে লয়ে যাও।
হে নাথ—করুণা-সিন্ধু! মোবে দেখা দাও॥
হে রুদ্র! প্রসন্ন মুখে চাহি মোর প্রতি
রক্ষা কব মোরে সদা করি এ মিনতি॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সত্যেরই—সত্যেরই—জয়, কভু না মিথ্যার।
কায়-মনঃ-প্রাণে কর সত্য-পথ সার॥
সত্যের প্রকাশে যার বিকাশে চেতন,
লভি সে পরম-ধন সত্য-সনাতন॥
চলিতেন ঋষিগণ ধরি সত্য পথ,
হইয়াছিলেন তাই সিদ্ধ-মনোরথ॥
— মহান্ আত্মার সেই পাইয়া সন্ধান,
সকল সত্যের যিনি পরম-নিধান॥
মনঃ-প্রাণাতীত সেই জ্যোতির্ময় অমৃত-পুরুষ—
অন্তরে-বাহিরে দেখে যতিসবে বিগত-কলুষ॥
দেবতাগণের তিনি অধিপতি ; লোক-লোকান্তর
অসংখ্য-অপরিমেয় সকলি তাহাতে করে ভর॥
মহান্ আতমা তিনি জনম-বিহীন নিরাধার।
সুর নর-পশুপক্ষী—সবে চলে নিয়মে তাঁহার।
তাঁরে কেহ দেখিতে না পায়।
তিনি দেখিছেন সমুদায়॥
শুনিতে না পায় কেহ তাঁরে
শুনিছেন তিনি সবাকারে॥
ভাবিয়া তাঁহার কেহ নাহি পায় অন্ত।
চরাচর-বিশ্ব তাঁর ভাবনা জীবন্ত॥
তাঁহারে জানে না কেহ এ তিন-ভুবনে।
সমস্ত ভুবন তাঁর নখ-দরপণে॥
'এ না' 'এ না', 'এ না' বলি ক্ষান্ত হয় বাণী।
পিছায় ইন্দ্রিয়-মন পরাভব মানি॥
সর্ব-অধিপতি তিনি সবার ঈশ্বর।
রেখেছেন শাসনে নিখিল-চরাচর॥
একজন ফল-ভুক, ফলদাতা অন্য।
বুদ্ধির গভীরে দোঁহে একত্র নিষণ্ণ॥
কি বা জ্ঞানী কিবা কর্মী—কহে বারে-বারে,
ছায়া-আতপের ভেদ দোঁহার মাঝারে॥

চতুর্দশ অধ্যায়

অনাদি-অনন্ত যিনি মহান্
তিনিই সুখ-রূপ।
অল্পে কভু নাহি সুখ!
কোথায় সমুদ্র, কোথা কূপ!
ভূমাই কেবল সুখ ;
ইচ্ছা কর জানিতে ভূমায়।
কোথায় আছেন সেই ভগবান?—
নিজ মহিমায়।
উচ্চে তিনি মহাব্যোমে,
নিচে তিনি পাতাল-গহ্বরে।
পশ্চাতে-সম্মুখে তিনি বিরাজেন,
দক্ষিণে-উত্তরে॥
ভূত-ভবিষ্যতের নিয়ন্তা ভগবান।
আজও তিনি, কালও তিনি, চির-বর্তমান॥
অদৃশ্য থাকিয়া যিনি অসংখ্যের কামনা-প্রবাহ
বিচিত্র শকতিযোগে করিছেন একাকী নির্বাহ ;
আদি-অন্তে-মাঝখানে ব্যাপ্ত যিনি জগৎসংসারে ;
শুভবুদ্ধি প্রদান করুন তিনি আমা-সবাকারে॥
সংসার, আকৃতি, কাল, সমস্তের তিনি পরপার
ফিরিছে বিশ্বভুবন নিরন্তর শাসনে তাঁহার ;
ধর্মের আকর তিনি পাপ-বিমোচন।
ঐশ্বর্যের অধিপতি বিশ্ব-বিধরণ॥
অমৃত আনন্দ তিনি আত্মার আধারে।
মহাশান্তি লভে জীব জানিয়া তাঁহারে॥
ত্রিভুবন-কর্তা তিনি ত্রিভুবন-জ্ঞাতা,
আত্মার কারণ তিনি কালের বিধাতা॥
গুণের নিয়ন্তা তিনি গুণের নিধান।
চেতনাচেতন-পতি সর্বজ্ঞ-মহান্॥
স্থিতি-গতি-মুক্তি আর সংসার-বন্ধন,
যাহা কিছু, সমস্তের তিনিই কারণ॥
জ্ঞানময় অমৃত, ব্যাপিয়া সর্বদেশ
বিরাজেন বিশ্বপাতা অটল মহেশ॥
তাঁহারি শাসনে ফিরে ভুবনমণ্ডল।
নিয়ন্তা এ-জগতের তিনিই কেবল॥

আত্মজ্ঞান-প্রকাশক সেই দেব চরাচর-স্বামী।
শরণ লইনু আমি তাঁর পদে হয়ে মুক্তিকামী॥
সেই এই ব্রহ্মের আরেক নাম সত্য।
তাঁহারি কিরণ-কণা নিখিলের তত্ত্ব॥
নিষ্কল-নিষ্ক্রিয়-শান্ত-শুদ্ধ নিরঞ্জন।
দীপ্ত হুতাশন তিনি কলুষ দমন॥
না হয় সংসার, ভেঙে চুরমার,
না টলে শশী-আদিত্য।
বাঁধ হয়ে তিনি গগন-মেদিনী
ধরিয়া আছেন নিত্য॥
না রাত্রি, না দিবস, না শোক না বিষাদ,
না জরা, না মৃত্যু পারে লঙ্ঘিতে সে বাঁধ।
সেই আত্মা অজর-অমর-বীতপাপ ;
নাহি যার ক্ষুধা-তৃষ্ণা, নাহি শোকতাপ ;
যা ইচ্ছেন, যা ভাবেন, সত্য সে তাহাই ;
অন্বেষিয়া সযতনে তাঁরে জানা চাই॥
অন্বেষিয়া যেই জানে বহু পুণ্য-ফলে,
ত্রিজগত পায় সে আপন করতলে॥
ধন্য হয় লভিয়া পরম-পুরুষার্থ।
সকল কামনা তার হয় চরিতার্থ॥
নাম তাঁর আকাশ! কি নাম দিব আর।
নিখিল নাম-রূপের তিনি মূলাধার॥
যাঁহার নাহিকো রূপ, নাহি যাঁর নাম,
তিনি ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত, শান্তিধাম॥
না বাক্যে না মনে তাঁরে কেহ পায়, না চক্ষে নেহারে।
"আছেন" ব্যতীত আর কি বলিয়া নির্দেশিব তাঁরে॥
যে দেখে পরমাত্মারে জাগ্রত-জীবন্ত,
নিয়ন্তা ভূত-ভব্যের অনাদি-অনন্ত,
তাঁ-হতে কিছু সে আর না করে গোপন।
কায়মনোবাক্যে সঁপে তাঁহাতে জীবন॥

পঞ্চদশ অধ্যায়

পাপ-আচরণ হতে না হইলে ক্ষান্ত ;
না হইলে সমাহিত, না হইলে শান্ত ;
হইলে বিভ্রান্ত-মতি ফল-কামনায় ;
জ্ঞান-বলে শুধু তাঁরে পাওয়া নাহি যায়॥
শ্রেয় আর প্রেয় ফিরে মনুষ্য-মাঝারে।
ধীর ব্যক্তি উভয়ের প্রভেদ বিচারে॥
শ্রেয় যে গ্রহণ করে বিপত্তি এড়ায়।
প্রেয় যে বরণ করে, সর্বস্ব হারায়॥
যে যা করে, সে তা হয় ; উল্টে না কদাপি।
সাধুকারী সাধু হয়, পাপাকারী পাপী॥
পুণ্য-আচরণে আত্মা হয় পুণ্যময়।
পাপ-আচরণে হয় পাপের আলয়॥
বুদ্ধিহীন যেইজন, মন যার সতত অস্থির,
তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ দুষ্ট অশ্ব যেন সারথীর॥
যেইজন সুবুদ্ধি, কর্তব্যে যার নাহিকো আলস্য,
তাহার ইন্দ্রিয়গণ সারথীর বশীভূত অশ্ব॥
জ্ঞান-শূন্য, সদা অন্য-মনস্ক, অশুচি যেইজন,
না লভে সে ব্রহ্মপদ, সংসারেই হয় নিমগন॥
বুদ্ধিমান যে জন, সংযতচিত্ত, পুণ্য-মুখদ্যুতি,
লভে সেই ব্রহ্মপদ, যাহা হইতে না হয় বিচ্যুতি॥
বুদ্ধি যার সারথী, মনের রাশ হস্তে আপনার,
সেই লভে ব্রহ্মের পরমপদ, সংসারের পার॥
ব্রহ্মের পরম-পদ, দেখে তত্ত্ব-বিশারদ
সবিদ্বান পণ্ডিত-সকলে।
দেখে যথা পুরবাসী বিস্তৃত আলোকরাশি
আঁখি মেলি গগন-মণ্ডলে॥
মোহান্ধ-অজ্ঞানী-সবে
হেথা হইতে যায় যবে চলি
লভে নিরানন্দ-লোক, অন্ধকার যেথায় সকলি॥

ষোড়শ অধ্যায়

শান্ত-দান্ত হয়ে, শীত-উষ্ণ সয়ে,
  ঠেলিয়া ফেলিয়া বিষয়-কাম ;
হয়ে সমাহিত, ধীর ব্রহ্মবিৎ,
  আত্মাতে দেখেন আত্মারাম॥
পাপ না ইঁহাকে স্পর্শে
  পাপের এড়ান ইনি হস্ত।
পাপ না ইহাকে দহে,
  পাপ-রাশি দহেন সমস্ত॥
নিষ্পাপ, নির্মল-চিত্ত, ব্রহ্মপরায়ণ,
শ্রদ্ধা-ভক্তি-সমন্বিত, ইনি ব্রাহ্মণ॥
পাইয়া আনন্দময়ে ভাসেন আনন্দে।
পাপ-তাপ-শোক-মোহ তরেন সচ্ছন্দে॥
হৃদয়ের গাঁট হতে লভিয়া নিস্তার,
করেন অমৃত হয়ে অমৃতে বিহার॥
সত্য কভু ছাড়িবে না, ছাড়িবে না ধর্ম।
ছাড়িবে না কদাচন শ্রেয়স্কর কর্ম॥
সত্য কহ , ধর্ম আচরণ কর ; ধর্মই অমৃত।
সমূলে শুখায় ছিন্ন তরুসম, যে কহে অনৃত॥
  যা দেও যাহাকে, দিবে—হয়ে শ্রদ্ধাবান্।
  অশ্রদ্ধা-সহিতে দিলে ব্যর্থ হবে দান॥
  মাতাকে-পিতাকে আর গুরুকে সতত,
  দেখিবে পরমপূজ্য দেবতার মতো॥
  অনিন্দিত সেই কর্ম, করিবে তাহাই।
  অন্যকাজে মনোমাঝে নাহি দিবে ঠাঁই॥
  সদাচার আমাদের যাহা দেখ-শোন,
  তাহাই করিবে সেবা, নহে অন্যকোন॥
  এইসব উপায়ে যতে যে জ্ঞানবান,
  তার আত্মা ব্রহ্মধামে করয়ে প্রয়াণ॥
শুন দিব্যধামবাসী অমৃতের যতেক সন্তান,
জানিয়াছি আমি সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ-মহান—
আদিত্যবরণ, তিমিরের পার! তারে জানিয়াই
মরণ এড়ায় জীব, নিস্তারের অন্যপথ নাই॥
আপনাতে ভর করি রয়েছেন যিনি এই নিত্য,
জানিবারই বস্তু তিনি, যে জানে সে হয় কৃতকৃত্য॥

ইহারে পাইয়া পূজ্য ঋষিগণ জ্ঞান-পরিতৃপ্ত,
প্রশান্ত, কৃতার্থমনা, বীতরাগ, বিষয়-নির্লিপ্ত,
পর্বত দেখিয়া, সেই সর্বাধারে, হয়ে যোগযুক্ত,
প্রবিশেন সর্বঘটে, বিষয়-বন্ধন-নিরমুক্ত॥
জীবাত্মা বিজ্ঞানময় সমুদয় ইন্দ্রিয়ের সাথে,
জীবজন্তু সবে আর, ভর করি রহিয়াছে যাতে,
সেই অবিনাশী ব্রহ্মে যেই জানে—জানে সব সত্য,
সকলের ভিতরে প্রবেশ করে, লভে অমরত্ব
তেজোময় পুরুষ। অমৃতময় সর্বজ্ঞ মহান্,
তিনিই আকাশে এই, তিনিই আত্মাতে বিদ্যমান।
তাঁরেই জানিয়া ধীর মরণ এড়ায়।
নিস্তারের নাহি আর কোনহ উপায়॥
ব্রাহ্মী উপনিষদ্ বলিনু এই—বলিনু তোমারে
ব্রাহ্মী উপনিষদ্ অভয়ভেলা ভব-পারাবারে॥
উপনিষদের সার ব্রহ্ম অন্তর্যামী।
কর-জোড়ে বার-বার নমি তাঁরে আমি॥
বাক্য, বল, প্রাণ আর যতেক অঙ্গ আমার
চক্ষু-কর্ণ-শিরোমুখ-হস্ত ;
বিতরি সন্তাপহারী সুবিমল শান্তিবারি,
পরিতৃপ্ত করুন সমস্ত॥
ব্রহ্মে আমি ত্যজিব না, আমারে ত্যজেন নাই প্রভু।
তাঁহারে ত্যজিব আমি, এমন না হয় যেন কভু॥
সেই আত্মা নিখিল-স্বামী ;
নিয়ত তাঁহাতে নিরত আমি॥
যতেক ধর্ম ধরে উপনিষদ-শ্লোক,
আমাতে হোক সব আমাতে হোক॥

দ্বিতীয় খন্ড :

প্রথম অধ্যায়

শিষ্য-প্রতি আচার্যের এই উপদেশ, শুন সবে-
গৃহিজন ব্রহ্মনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হবে॥
সাবধানে আচরিবে গৃহস্থের যাহা-যাহা ধর্ম।
সঁপিবে পরম-ব্রহ্মে অনুষ্ঠিত যতকিছু কর্ম॥

পিতা আর মাতাকে সাক্ষাৎ জানি দেবতা প্রত্যক্ষ,
করিবে দোঁহার সেবা, কায়-মনে, তনয় সুদক্ষ॥
শুনাবে মৃদুলবাণী, প্রিয় আচরিবে অহরহ।
সৎপুত্র কুলপাবন হইবে দোঁহার আজ্ঞাবহ॥
মাতাই পরমগুরু, অন্য-সনে তুলনা-রহিতা।
পৃথ্বী হতে গুরু মাতা, আকাশ হইতে উচ্চ পিতা॥
যেই ক্লেশ সহেন গো পিতা-মাতা সন্তানের তরে,
শুধিতে না পারে তাহা কোনোজন শতেক বৎসরে।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতাসম, ভার্যাপুত্র শরীর আপন।
দাসবর্গ ছায়াসম, কন্যাগুলি কৃপার ভাজন॥
ইহাদের কারো উপদ্রবে কভু হলে জ্বালাতন,
সহিবে ধৈরজ ধরি বিচলিত করিবে না মন॥
অতিবাদ সহিবে, অবজ্ঞা করিবে না কোনোজনে।
ধরি এই মর্ত্যদেহ, বৈরী করিবে না কারো সনে॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

যতদিন না হয় বিবাহে বাঁধা, অর্ধ থাকে নর।
বালকে না হলে ভরা, শ্মশানের মতো হয় ঘর॥
সন্তানের জননী বলিয়া ভার্যা, সম্মানের পাত্রী,
পূজনীয়া, গৃহের বিমল দীপ্তি. মঙ্গলের ধাত্রী ;—
দেখিলে ঘুচিয়া যায় নয়নের খেদ।
স্ত্রীয়ে আরে শ্রীয়ে নাই অনুমান ভেদ॥
সর্বাঙ্গসুন্দরী বিবাহিবে নর সুশীলা-সরলা।
মূল্যে কেনা যেই কন্যা পত্নী তারে নাহি যায় বলা।
পরস্পর ব্যভিচারী হইবে না থাকিতে জীবন ;—
স্ত্রী-পুরুষ-মাঝারে ইহাই জেনো ধর্ম-সনাতন॥
দোঁহা-প্রতি দোঁহে সদা সেইরূপ করিবে যতন,
বিচ্ছেদ ঘটিয়া যাতে অন্য-পানে নাহি টলে মন।
স্বামীতে সন্তুষ্ট জায়া, জায়াতে সন্তুষ্ট আর পতি ;
হেন সুখাবহ গৃহ কল্যাণের চির-নিবসতি॥
সে-ই ভার্যা যে পতিপ্রাণা,
সে-ই ভার্যা যে পুত্রকন্যাবতী ;
শুদ্ধ মনে সতত যে শুনি চলে, যাহা বলে পতি॥

যাহা-তাহা ভাষিবে না, করিবে না কলহ-বিবাদ।
অতিব্যয়ী ইহবে না, ধর্ম-অর্থে সাধিবে না বাদ॥
পতির মঙ্গল আর প্রিয়কার্যে সতত নিযুক্তা ;
সদাচার যে নারী সংযতেন্দ্রিয়া, সর্বদোষ-মুক্তা ;
সেই নারীরত্ন তিনকুলের উজ্জ্বল করে মুখ।
ইহলোকে লভে কীর্তি, পরলোকে অনুপম সুখ॥
পতিবাক্য শুনি চলা স্ত্রীজাতির পরম ধরম।
সাধ্বী-সতী জায়া ত্যজি, পতি হয় পাপীর অধম॥
স্ত্রীজনের গাত্রে যেন দুঃসঙ্গের না লাগে পরশ ;
কাঁদায় উভয় কুল লোকে যদি রটে অপযশ॥
কি করিবে অবরোধ। অরক্ষিতা চির-অরক্ষিতা।
আপনাকে আপনি, যে রক্ষা করে সেই সুরক্ষিতা॥
অগ্রজের যিনি ভার্যা, গুরুপত্নী যেন আর্যা—
দেখিবেন তাঁরে ছোট ভাই
কনিষ্ঠের ভার্যা যিনি, পুত্র-বধূ-সমা তিনি
অগ্রজের ; ইহা জানা চাই ॥

তৃতীয় অধ্যায়

স্ত্রী-পুত্র পালিবে গৃহী যত্ন-সহকারে।
বিদ্যাভ্যাস করাইবে পুত্র সবাকারে॥
স্বজন-বন্ধু-বান্ধব করিবে পোষণ।
গৃহী রে জানিবে এই ধর্ম-সনাতন॥
কন্যাকেও যতনে শিখাবে বিদ্যা,
পালিবে আদরে।
ধন-রত্ন সহিতে সঁপিয়া দিবে সুপণ্ডিত বরে॥
যেমন পতির হাতে পড়ে নারী, তেমনি সে হয়।
সমুদ্রে পড়িলে নদী, হয়ে যায় লবণাম্বুময়॥
জানে না স্বামী কি বস্তু
স্বামি-সেবা জানে না কেমন ;
ঘৃণাক্ষরে জানে না
কাহারে বলে ধরম-শাসন
হেন যে দুহিতা জ্ঞান-বিরহিতা বালিকা নিতান্ত ;
তাহার বিবাহ দিতে মতিমান্ পিতা রবে ক্ষান্ত॥

স্থির করিবার কালে বিবাহের পাত্র,
পণ না লইবে পিতা কপর্দক-মাত্র॥
লোভের পড়িয়া টানে লয় যদি পণ,
কন্যা-বিক্রয়ের পাপে হয় নিমগন॥

চতুর্থ অধ্যায়

শুক্লকেশ যাহার সে নহে বৃদ্ধ ;
দেবতা-সকলে
তাহারাই জানে বৃদ্ধ—
যৌবনেই বিদ্যা যার ফলে॥
মৌনে মুনি না হয়
না হয় মুনি জটাজুট-ভারে।
আপনারে পছানে যে বিচক্ষণ,
মুনি বলি তারে॥
আপনারে করিবে না হেয়জ্ঞান
ধনহীন বলি।
আমরণ শ্রী করিবে অন্বেষণ,
বাধাবিঘ্ন দলি॥
আত্মবশ সবই সুখ
পরবশ দুঃখ অবিরাম।
সুখ-দুঃখ কারে বলে
দু-কথায় বলিয়া দিলাম॥
মূলক্ষয় করিবে না অতি লোভে,
মূল খোয়াইলে,
আপনি ডুবিবে, অন্যে ডুবাইবে,
বিপত্তি-সলিলে॥
যৌবনেই ধর্ম-ধন সঞ্চিবে
জীবন অনিশ্চিত।
কে জানে কাহার আজ
মৃত্যুকাল হবে উপস্থিত॥
সুচরিত্র-সুশীল প্রসন্ন-মনা
আত্মজ্ঞ-সুমতি,
ইহলোকে লভে মান
পরেলোকে অনুত্তম গতি॥

সত্য-দান-তপস্যা
এ তিন যার অঙ্গের ভূষণ ;
বাক্য-মন বশে যার,
সেই লভে ব্রহ্মনিকেতন॥
প্রশান্ত যাহার মন ; ধর্মে সদারত ;
কাজ-কর্মে কাটে দিন যাহার নিয়ত,
অধর্মে সে নাহি করে হৃদয়ে পোষণ।
পাপে নাহি হয় কভু স্খলিত-চরণ॥
ধর্মে-অর্থে ঠেলিয়া যে ইন্দ্রিয়ের পাছু-পাছু ধায়,
ধন-প্রাণ, স্ত্রী-পুত্র, শ্রী-শোভা, সব শীঘ্র সে হারায়॥
বন্ধু সে-ই আপনার, আপনি, যে আপনার হাতে।
বন্ধু-শত্রু দুইই জেনো ফিরিছে আপন সাথে-সাথে॥
লভিয়া উত্তম জন্ম—ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব চমৎকার,
আত্মহিত যে না বোঝে, আত্মঘাতী সে একপ্রকার॥
তেমনি করিবে কাজ, যৌবনের হইতে উন্মেষ,
সুখে যাতে কাটাইতে পার কাল শুক্ল হলে কেশ॥
করিবে তেমনি কাজে সমস্ত জীবন অবসান,
সুখী হতে পার যাতে পব-লোকে করিয়া প্রয়াণ॥
ইচ্ছিবে না মৃত্যু কভু, ইচ্ছিবে না পরমায়ু-ভোগ।
প্রতীক্ষা করিবে কাল ভৃত্য-যথা প্রভুর নিয়োগ॥

পঞ্চম অধ্যায়

প্রবাহিত রাখি হৃদে সন্তোষের নদী,
হইবে সংযত-চিত্ত সুখ চাও যদি॥
সন্তোষ সুখের মূল ইথে নাহি ভুল।
অসন্তোষই যতকিছু অসুখের মূল॥
মূর্খেরাই অসন্তোষে মনে দেয় স্থান।
সন্তোষ করেন সার যেজন ধীমান॥
অন্ত কভু নাহি জানে দুরন্ত পিয়াস।
সন্তোষ কেবলি এক সুখের নিবাস॥
কালচক্রে সুখ-দুঃখ ঘুরে দিবারাতি।
সুখে লবে ক্রোড় পাতি, দুঃখ বুক পাতি॥
আসে-যায় সুখ-দুঃখ নাহি রহে স্থির।
দুয়েরই বিহার-ভূমি মর্ত্যের শরীর॥

সুখ-দুঃখ প্রিয়া-প্রিয় যা আসে যখন,
সেবিতে অজিত-চিতে তাহাই তখন॥
অতি হৃষ্ট হইবে না প্রিয়-সমাগমে।
অপ্রিয়ে হবে না ম্লান ব্যথিয়া মরমে॥
করিবে না হাহুতাশ হলে অনটন।
ধর্ম ত্যজিবে না কভু থাকিতে জীবন॥
সন্তাপে শরীর হয় রোগের-নিবাস ;
রূপ যায়, বল যায়, বুদ্ধি পায় নাশ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

আপন পৌরুষ কিম্বা যশের বিস্তার ;
অন্যের কথিত কোন গুপ্ত সমাচার ;
সাধিত বা হয় যাহা পর-হিত-তরে ;
ধর্ম না প্রকাশিবে কাহারো গোচরে॥
সত্য, মৃদু, প্রিয়, হিতকর বাক্য, কহিবে সজ্জন।
আপনার প্রশংসা, পরের নিন্দা করিবে বর্জন॥
সত্যই যাহার ব্রত ; পরদুঃখে মন যার গলে,
কাম-ক্রোধ বশে যার, তিনলোক তার করতলে॥
নিস্পৃহ যে পরধনে ; পরদারে মন নাহি টলে ;
দম্ভ-মাৎসর্য-বিহীন ; তিন তার করতলে॥
যুদ্ধে যে না ভয় পায়, সংগ্রামে না পরাঙ্মুখ হয়,
ন্যায়যুদ্ধে মরেও যদি সে, করে তিনলোক জয়॥
সত্য কবে. প্রিয় কবে. নাহি কবে অপ্রিয় যে সত্য।
প্রিয় মিথ্যা না কহিবে ; সার এই ধরমের তত্ত্ব॥
শরীরের শোধন সলিলে হয়, সত্যে শোধে মন।
বিদ্যাতপে শোধে আত্মা, জ্ঞানে হয় বুদ্ধির শোধন॥
মনে ধরি এক ভাব, অন্যভাবে যে খেলে চাতুরী
কি না করে মহাপাপ চোর সে আপনে করে চুরি॥
সত্য-সম ধর্ম নাই, শ্রেষ্ঠ কিছু নাই সত্য হতে।
মিথ্যার মতন নাই হেয় বস্তু এ তিন জগতে॥
প্রিয় হয় অর্থ দিয়ে, প্রিয় হয় প্রিয় আলাপিয়ে।
অপ্রিয় হিতের, হায় কেহ নাই কহি এ শুনি এ॥

সপ্তম অধ্যায়

সাক্ষাতে যা দেখা যায়, শুনা যায়, সাক্ষ্য তারি নাম।
সত্য যদি কহে সাক্ষী, ধর্মার্থ না হয় তারে বাম॥
যা দেখেছ যা শুনেছ কহিবে তাহাই ঠিকঠাক্।
কিছুতেই সাক্ষীর নিস্তার নাই বিনা সত্যবাক্॥
সাক্ষ্য দিতে দাঁড়াইয়া অন্তরাত্মা যাহার না ডরে।
তার মতো শ্রেষ্ঠ নর দেবতারা জানে না অপরে॥
মনে করিও না তুমি, ওহে বাপু "একা আছি আমি"।
মৌন থাকি দেখিছেন—সব, বিভু অনতর-যামী॥

অষ্টম অধ্যায়

কল্যাণ বুঝিবে যাহা, তাহাই ধরিয়া রবে আঁটি,
পাপে কভু করিবে না প্রতিপাপ, সদা রবে খাঁটি॥
অক্রোধে জিতিবে ক্রোধ, অসাধুতা গুণে।
অসত্য জিতিবে সত্যে, কদর্যে শোভন সদ্‌গুণে॥

সুখ-দুঃখ-মাঝারে যে ধরি থাকে হাল ;
সজ্জন-সেবায় আর কাটে যার কাল ;
সত্য আর সাধুতার নির্মল বাতাসে ;
ধর্ম-পথে বুদ্ধি তার উজ্জ্বল প্রকাশে॥
মূর্খ-সহবাসে হয় মোহের সংক্রম।
ধর্মের আকর-ভূমি সাধু-সমাগম॥

মোহে পড়ি যেইজন হিতবাক্য অবহেলা করে ;
হাহুতাশ করিয়া সে দীর্ঘসূত্রী, অনুতাপে জরে॥
সাধুর বাক্য যে হেলি, অসাধুর বাক্য শুনি চলে,
অচিরে তাহার দুঃখে বন্ধুজন ভাসে অশ্রুজলে॥

কৃতজ্ঞ যে মতিমান কাজকর্মে পটু ;
জানে না কাহাকে বলে ব্যবহার কটু ;
লভে সে বিমল কীর্তি লোকের নিকটে ;
এ জনমে কভু তার অনর্থ না ঘটে॥

কৃতঘ্নের কোথা যশ, কোথা স্থান, কোথায় বা সুখ।
অতি বড় পাতকী সে, তাহার দেখিতে নাই মুখ॥

নবম অধ্যায়

খাবার বাঁটিয়া খায় যেইজন সবার সহিত ;
দিতে-থুতে ভালোবাসে, ভোগী-সুখী হিংসা-বিরহিত
আপনি খাইয়া, অন্যে খাওয়াইয়া ভাসে তৃপ্তি-নীরে,
নিরন্তর আরোগ্যে বিরাজ করে তাহার শরীরে॥
যে যেমন পাত্রে আর যে যেমন চিত্তে করে দান,
পরলোকে লভে সে তাহার ফল সেই পরিমাণ।
দানের সমান, বৎস, সুদুষ্কর কিছু নাহি আর।
মহাতৃষ্ণা ধন-তরে, মহাকষ্ট উপার্জনে তার,
অন্যায়ে যে লভি ধন, দান-ধর্ম করে অনুষ্ঠান ;
মহদ্ভয় হইতে সে কদাপি না পায় পরিত্রাণ॥
ন্যায়াজিত ধনে আচরিবে সদা জ্ঞান যাহা বলে।
অন্যায়ে যে জিয়ে, তাঁর সব ধর্ম যায় রসাতলে।
যথাশক্তি অন্ন দিবে, কষ্ট সবে, হবে ধর্মে রত।
যথাযোগ্য সম্মান, সবার প্রতি করিবে নিয়ত॥
দিবে সবে যাহার যা সদ্য প্রয়োজন।
পরিশ্রান্ত-জনে দিবে বসিতে আসন॥
শয্যা দিবে তাহারে—যে রোগে অবসন্ন।
তৃষ্ণাতুরে দিবে জল ক্ষুধাতুরে অন্ন॥
সর্বাপেক্ষা অন্নদান করি দাতা তৃপ্তি লভে প্রাণে।
ভূমি-দানে মহাপুণ্য, তাহার অধিক বিদ্যাদানে॥
হও যদি বুদ্ধিমান, চাও যদি শ্রেয়,
দীন-অন্ধে-কৃপাপাত্রে, দিবে যাহা দেয়—
দিবে মাখিবার তৈল, দিবে আর থাকিবার ঠাঁই .
দিবে অন্ন-পানীয়-ঔষধ-পথ্য যাহার যা চাই॥
না দেখি দুঃখী স্বজনে, যেইজন অন্যে করে দান,
দেখিতে তা মধু, আস্বাদনে বিষ, ধর্মের সে ভান॥

দশম অধ্যায়

মনোদুঃখ জ্ঞান-বলে, দেহ-দুঃখ হানিবে ঔষধে।
জ্ঞানী দেখে পরাগতি ; শোকানল তারে না দগধে॥
মান ত্যজি প্রিয় হয়, ত্যজি আর ক্রোধ
পশ্চাত্তাপের হাত এড়ায় সুবোধ॥

কামনা যে ত্যজে তার সবধন মিলে।
সুখের প্রবাহ বহে লোভ তেয়াগিলে॥
ক্রোধ সুদুর্জয় শত্রু, লোভ-ব্যাধি জানে না বিরাম
সর্ব-হিতকারী সাধু, অসাধু তো নির্দয়েরই নাম॥
জিতেন্দ্রিয় শান্ত নর, বিপাকে না পড়ে বারেবার।
পরস্ত্রী দেখিলে, আর জ্বলিয়া না হয় ছারখার॥
ঈরিষায় জ্বলে যে পরের ধনে, রূপে, সু-সন্তানে,
সুখে, মানে, কুলে, বীর্যে, ব্যাধি তার অন্ত নাহি জানে
শত্রুতা সাধে সে নর বন্ধুজন-সনে,
গুণিজনে দেখে আর বিদ্বেষ-নয়নে ;
নাস্তিক, কপট, শঠ, নীচ, দুরাশয় ;
তাহারেই নরাধম সর্বলোকে কয়॥
অকার্যেই কার্য আর কার্যই-অকার্য যার চক্ষে,
বালক সে স্বেচ্ছাচারী, সুখ বলি দুঃখ পোষে বক্ষে॥

একাদশ অধ্যায়

ধৈরজ, সংযম, ক্ষমা দেহ-মন-শুদ্ধি ;
অচৌর্য-অক্রোধ-সত্য-বিদ্যা আর বুদ্ধি ;
সমস্ত ইন্দ্রিয় আর আপনার বশে ;
ধরমের লক্ষণ জানিবে এই দশে॥
পাপে লজ্জা স্বাভাবিক—তাহা যে না ছাড়ে ;
পাপ যে দেখিতে নারে ; শ্রী তাহার বাড়ে।
লজ্জা গেলে ধর্ম যায় সেইসঙ্গে চলি।
ধর্ম গেলে শ্রী পলায় কাটিয়া শিকলি॥
কারো কোনো গুণে যে না দোষারোপ করে ;
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আর উপকার স্মরে
সতত কল্যাণ-পথে করে বিচরণ ;
সুখ-শান্তি-ধর্ম-স্বর্গ লভে সেইজন।
দণ্ডের সবাই বশ ; খাঁটি লোক বিরল এ-ভবে।
দণ্ডের ভয়েই ত্রিভুবন চলে বিনা উপদ্রবে॥
অন্যায় করিলে দণ্ড অপযশ রটে সর্বজন ;
স্বরগে কপাট পড়ে ; করিবে না তাহা কদাচন॥
ক্ষমা বশীকরণ, ক্ষমা পরমধন।

ক্ষমা অশক্তের গুণ, শক্তের ভূষণ॥
আপনার সমান দেখিবে অন্যে, যে চাহে কল্যাণ।
সুখ-দুঃখ, ধরা-মাঝে, আত্মপর উভয়ে সমান॥
পরদারে মাতৃসম দেখে যেইজন।
পরের সামগ্রী দেখে লোষ্ট্রের মতন।
সকল মনুষ্যে দেখে আপনার-সম।
তাহার দেখাই দেখা—তারে করি নম॥

দ্বাদশ অধ্যায়

পরে-নিন্দি সাধু হয় যেমন দুঃখিত
দুর্জন তেমনি হয় হর্ষে পুলকিত॥
বিপদের মাঝারে ব্যথে না যার চিত্ত ;
কাজকর্মে সুনিপুণ উদ্যোগী যে নিত্য ;
প্রমাদ-বিহীন আর বিনয়ী যে জন ;
কল্যাণ তাহার গৃহে করে সঞ্চরণ॥
থাকিতে ধন-সমৃদ্ধি রাজ্য সুবিশাল,
অবিনয়ে হত হইলা কত মহীপাল॥
বনবাসে কত রাজা দহি মনাগুনে,
ফিরিয়া পাইল রাজ্য বিনয়ের গুণে॥
অন্তরাত্মা তোমার সন্তোষ মানে যেইরূপ কাজে
করিবে তা সযতনে , করিবে না হৃদে যাহা বাজে॥
প্রাণপণ যতনে ধরম-কার্য সাধয়ে যে কেহ ;
সিদ্ধি যদি নাও লভে, পুণ্য লভে নাহিকো সন্দেহ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিষয়ের টানে পড়ি ইন্দ্রিয় দৌড়ায় যবে তথি ;
টানিয়া রাখিবে তারে, অশ্বে যথা নিপুণ সারথী॥
মন যদি ছুটি চলে ইন্দ্রিয় যেদিকে যবে ধায়,
ডুবাইয়া দেয় জ্ঞান, বায়ু যথা তরণী ডুবায়॥
উপভোগে শান্তি নাহি মানে কভু কামনা কাহারো।
অনলে ঢালিলে ঘৃত, নিভে না সে, জ্বলি উঠে আরো।

ক্ষরিলে ইন্দ্রিয় কোনো বুদ্ধিও ক্ষরিতে শুরু করে ;
কলসের ছিদ্র দিয়া জল যথা ক্রমশ নিঃসরে॥
না সেবিলে, তেমন না আসে বশে, ইন্দ্রিয় উদ্দাম,
দৃঢ় করে যেমন, থাকিলে ধরি জ্ঞানের লাগাম॥
কাম-ক্রোধ-পর নর, মূর্খ বা বিদ্বান্ হোন তিনি,
হেলায় বিপথে লয়ে যায় তাঁরে চতুরা কামিনী॥
দুর্দান্ত ইন্দ্রিয় দশ, সংযমে করিয়া বশ,
মন্ করি জ্ঞানের অধীন ;
উপায় করিয়া ধার্য সাধিবে সকলকার্য
কলেবর না করিয়া ক্ষীণ॥

চতুর্দশ অধ্যায়

কারো প্রতি যে না করে পাপাচার বাক্য-মন-কর্মে
সংযত-সুধীর সেই পুণ্যবান্ লভে পর-ব্রহ্মে॥
পুণ্য করি পুণ্যকীর্তি, পুণ্য-নিকেতনে যায় চলি।
পুণ্যে প্রাণ ধরে লোক, পুণ্যকে প্রাণদাতা বলি।
পাপ যে চিন্তয়ে মনে, করে কাজে, মুখে আর বলে
অধর্মে ডুবিয়া তাঁর সব গুণ যায় রসাতলে॥
মনোবাক্যে-কর্মে যাঁরা না করেন পাপ-আচরণ,
তাঁহারাই তপস্বী, তপস্যা নহে দেহের শোষণ॥
ধর্মেই আনন্দ যাঁর, ধর্মেই থাকেন যিনি জিয়া ;
ধর্মাত্মা তাঁরেই বলি ; সদাই প্রসন্ন তাঁর হিয়া॥
আত্মা যাঁর পাপ হইতে বিরত, নিরত লোকে হিতে
কি প্রকৃতি, কি বিকৃতি তিনিই তা পাবেন বুঝিতে॥
প্রজ্ঞা যাঁর নয়ন, নির্দোষ তাঁর সমুদয় কর্ম।
ছাড়েন বিষয়-স্পৃহা ইচ্ছামতে ; ছাড়েন না ধর্ম॥
পাপাত্মা ইচ্ছয়ে পাপ, সহস্র বারণ অবহেলি।
শুভাত্মা ইচ্ছেন শুভ, সহস্র পাপের বাধা ঠেলি॥
ধর্মে রাখিলেই—ধর্ম রাখে, নাশিলেই নাশে জীবে ;
হত হয়ে ধর্ম না হানুন বাজ—ধর্মে না হানিবে॥
ধর্ম সেই সুহৃৎ যে মরিলেও নাহি ছাড়ে পাশ ;
আর যতকিছু সব দেহ-সাথে লভয়ে বিনাশ॥
অবিশ্বাসী যেই নর সাধুজনে করে উপহাস—
ধর্ম নাই মনে করি ; নিঃসংশয় তাহার বিনাশ॥

অপমানিত যে হয়, সুখে সে বিরহে বারোমাস
সুখে শোয়, সুখে জাগে, অবমন্তা লভয়ে বিনাশ॥
পাপ করি পাপকীর্তি দহে পাপানলে।
পুণ্য করি পুণ্যকীর্তি বাড়ে পুণ্যফলে॥
অতএব পাপ করিব না বলি হও দৃঢ় ব্রত।
পুনঃপুনঃ পাপাচারে জ্ঞান-বুদ্ধি সব হয় হত॥

পঞ্চদশ অধ্যায়

সর্বজন প্রশংসিত সাধু আচরণ ;
লোক-বিগর্হিত কার্য পরিবরজন;
আস্তিকতা, ধর্মে আর বিশ্বাস অটল ;
এইগুলি পণ্ডিতের পরিচয়-স্থল॥
ক্ষমাই পরমা-শান্তি, ধর্মই কল্যাণ মূর্তিমান।
বিদ্যাই পরমা-তৃপ্তি, অহিংসাই সুখের নিধান॥
মনো-বাক্য-দেহ-সমুদ্ভূত কর্ম শুভাশুভ-কর।
উচ্চ-নীচ-মধ্যম ত্রিবিধ গতি তাহে লভে নর॥
পরদ্রব্য মনে ধ্যান ; পরানিষ্ট-চিন্তা অনুদিন
দেহাদিতে অতিমায়া ; মানসিক পাপ এই তিন॥
পরোক্ষে পরের নিন্দা , বাঁধন-বিহীন বাক্যালাপ,
কটু কথা ; মিথ্যা কথা, এই চারি বাচনিক পাপ॥
পরধন অপহার ; প্রাণিহত্যা অবিধি-পূর্বক ;
পরদার-সেবা আর ; এই তিন দৈহিক পাতক॥
কারো প্রতি না করে কার্য এই তিনরূপ দূষ্য,
কাম-ক্রোধ সংযমিয়া, সিদ্ধি লভে সুবোধ মনুষ্য॥
পাপ করি যে করে বিহিত অনুতাপ,
ক্রমশ খণ্ডিতা যায় তাহার সে পাপ॥
"আর করিব না" বলি হইলে নিবৃত্ত,
অনুতাপানলে দহি শুদ্ধ হয় চিত্ত॥

ষোড়শ অধ্যায়

অধার্মিক যেই নর, মিথ্যা কথা জীবিকা যাহার,
হিংসায় সে জন রত, সুখ নাই ইহলোকে তার॥
পাপীরে যদিও দেখ, বিচরিছে অশ্ব-গজ-রথে ;
কষ্টে আর কাটিছে সাধুর দিন ধরমের পথে ;
বারেক না দিবে মন অধর্মে তথাপি।
পাপের কুহকে ভুলে হইবে না পাপী॥
অধর্মের ধন-ঐশ্বর্যে কাঁপি উঠে লোক ;
চারিদিকে মঙ্গলের নিরখে আলোক ;
শত্রুগণে করে জয় ; পূরে অভিলাষ ;
সবই হয় ; কিন্তু পায় সমূলে বিনাশ॥
পরলোকে চাও যদি অমোঘ সহায় ;
কাহুকে না দিয়ো পীড়া কাজে বা কথায় ;
পুত্তিকা যেমন রচে বলমীক ধৈরজ ধরিয়া,
সঞ্চিবে ধরম-ধন অল্পে-অল্পে তেমনি করিয়া॥
পরলোকে সহায় হইয়া কেহ নাহি দিবে দেখা—
পিতামাতা, পুত্রদার, জ্ঞাতিবন্ধু ; ধর্ম রবে একা॥
একাই জনমে নর, একা হয় মৃত।
একাই সুকৃত ভুঞ্জে, একাই দুষ্কৃত॥
কাষ্ঠ-লোষ্ট্র সমান ভূতলে ত্যজি মৃত কলেবর
বন্ধুগণ যায় চলি, ধর্ম হয় পথের দোসর॥
অতএব চাও যদি সহায় পরম,
অল্পে-অল্পে নিতি-নিতি সঞ্চিবে ধরম॥
ধর্মের সহায়ে জীব, সংসার আঁধার
মহাঘোর সুদুস্তর, হয়ে যায় পার॥
এই উপদেশ—এই আদেশ—এই অনুশাসন।
পালিবে ইহা, সঁপিয়া দিয়া কায়-মনোবচন॥

১

ভজন, ঝাঁপতাল

অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, প্রণমি চরণে তব,
প্রেমভক্তিভরে শরণ লাগি।
দুর্মতি দূর করি শুভ মতি দাও হে, এই বর-দান ভগবান মাগি।
ঘোর নিষ্ঠুর রিপু অন্তরে বাহিরে, ভীত অতি আমি এ অন্ধকারে,
দীনবৎসল তুমি, তার নিজ সেবকে, তব অভয়মুরতি ভয় নিবারে।
বিষয়-মোহার্ণবে মগন হয়ে ডাকি হে, দীনহীনে প্রভু রাখ রাখ,
তব কৃপা যে লভে, কি ভয় ভবসঙ্কটে, কাটি যাবে বিপদ লাখ লাখ॥

২

ভৈরবী, ঝাঁপতাল

অনুপম-মহিম পূর্ণব্রহ্ম কর ধ্যান, নিরমল পবিত্র উষাকালে।
ভানু নব তাঁর সেই প্রেমমুখচ্ছায়া, দেখ ওই উদয়গিরি শুভ্র ভালে।
মধু-সমীরণ বহিছে এই যে শুভদিনে,
তাঁর গুণগান করি অমৃত ঢালে।
মিলিয়ে সবে যাই চল ভগবত-নিকেতনে,
প্রেম-উপহার লয়ে হৃদয়-থালে॥

৩

মিশ্র পবজ, ত্রিতাল

আজি কি হরষ-সমীর বহে প্রাণে! (এ কি)
প্রেমকুসুম ফুটে হৃদিকাননে।
ভগবত-মঙ্গল-কিরণে,
উজল জগত শত বরণে।
'নাথ নাথ' বলি, প্রাণ মন খুলি, গায় সবে একতানে
পুরে দিশি দিশি আনন্দগানে॥

৪

বসন্ত, সুরফাঁক্তা

আনন্দে আকুল সবে দেখি তোমারে।
পুরিল হৃদয় প্রীতি-বিমল-কুসুম-সুবাসে,
তব প্রসাদ সব দুঃখ তাপ নিবারে।
সকল-কলুষ-ভঞ্জন জগ-জন-চিত-রঞ্জন,
তোমারি প্রেম মধুময় জীবন সঞ্চারে॥

৫

কেদারা, চৌতাল

এক প্রথম-জ্যোতি, অতি শুভ্র, পরমব্রহ্ম,
প্রভু সর্বলোকসেতু পরমেশ্বর।
রাজ-রাজ বিশ্বরাজ, আদি কোথায়, অন্ত কোথায়, বিশ্বম্ভর!
মহাব্যোমে তোমারি শাসনে ধাইছে তারা রবি শশী,
ধায় সসাগর মহী, সুমহত যশ ঘোষে।
ভূলোক দ্যুলোক তোমারি রাজ্য, অতুলন তব ঐশ্বর্য,
তুমি মহান্, তুমি পুরাণ, দীন-শরণ মঙ্গলময়॥

৬

ঝিঁঝিট, ঠুংরি

কর তাঁর নাম গান, যত দিন রহে দেহে প্রাণ।
যাঁর হে মহিমা জ্বলন্ত জ্যোতি, জগত করে হে আলো,
স্রোত বহে প্রেমপীযূষবারি, সকলজীবসুখকারী হে।
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত, বাক্যে বলিতে কি পারি?
যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্তে সকল শোক অপসারি হে।
উচ্চে নিচে, দেশদেশান্তে, জলগর্ভে, কি আকাশে,
"অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর" এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে।
চেতননিকেতন পরশরতন, সেই নয়ন অনিমেষ,
নিরঞ্জন সেই, যাঁর দরশনে নাহি রহে দুঃখলেশ হে॥

৭

সাহানা, আড়াঠেকা

কেমনে কহিব, কি সুধাময় শোভা হেরিনু হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে!
অপরূপ অরূপ নাহি যে তুলনা, কী বলিব!
কী সুধাময় শোভা হেরিনু হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে!
দুর্লভ দরশন লাভ হল জীবনে, ধন্য রে তাঁর করুণা, ধন্য রে।
কী সুখে হেরিনু হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে॥

৮

কুকব, কাওয়ালি

গভীর-বেদনা-অস্থির প্রাণ, কর হে আমারে শান্তি দান।
মোচন কর হে পাপ তাপ, ঘুচাও রোদন বিলাপ।
কেবলি তোমারি আশ্রয়ে, তরিব সাগর নির্ভয়ে,
সে যায় যাক. যে থাকে থাক্, শুনে চলি তোমারি ডাক।
তরঙ্গ ঘোর কর হে পার, মন-তরীর হর হে ভার,
তুমি বিনা কর্ণধার কেহ নাহি আর আমার॥

৯

হাম্বীর, সুরফাঁক্তা

ঘোর গহন ভবসঙ্কটে আর কে জীবনসম্বল।
থাকো হে বন্ধু তুমি সঙ্গে, অবিচল ভূধর-আশ্রয়।
ভীষণ সিন্ধুতরঙ্গনাদ নামে তব নীরব,
শরণ যাচি হে করুণাসিন্ধু, আনন্দসাগর।
প্রাণেশ্বর, প্রাণ বিতবো, হৃদিমাঝে আসি বন্ধন ঘুচাও।
আছি নাথ দিবানিশি ওই চরণতলে, প্রসাদে বঞ্চিত কোর না।

১০

কানাড়া, ঝাঁপতাল

চমৎকার অপার জগত-রচনা তোমার,
শোভার আগার বিশ্বসংসার
অযুত তারকা চমকে রতন-কাঞ্চন হার,
কত চন্দ্র, কত সূর্য, নাহি অন্ত তার।
শোভে বসুন্ধরা ধনধান্যময়, হায়, পূর্ণ তোমার ভাণ্ডার।
হে মহেশ, অগণন লোক গায়
"ধন্য তুমি ধন্য" এই গীতি অনিবার॥

১১

সোহিনীবাহার, ঝাঁপতাল

জগত-বন্দনে ভজ, পবিত্র হবে জীবন,
পাইবে অনন্ত ফল, লাভ হবে পরম ধন।
অন্ধতম কে এমন, তাঁরে যে কভু দেখে না,
ধিক্ সে জীবন তার, পাপ-তাপে মগন।
পরম করুণাধার সেই পতিতপাবন,
তাঁর পদে প্রণম, নাহি রহিবে মোহাবরণ।
সুগভীর নিশীথে চন্দ্র সুন্দর মধুর,
শোভয়ে যাঁর শোভায়, কেমন তিনি মনোহরণ।

১২

বিভাস, ঝাঁপতাল

জয় জয় পরব্রহ্ম, অপার তুমি অগম্য,
পরাৎপর তুমি সারাৎসার,
সত্যের আলোক তুমি, প্রেমের আকরভূমি, মঙ্গলের তুমি মূলাধার।
নানারসযুত ভব, গভীর রচনা তব, উচ্ছ্বসিত শোভায় শোভায়,
মহাকবি, আদিকবি, ছন্দে উঠে শশী রবি, ছন্দে পুন অস্তাচলে যায়।
তারকা কনককুচি, জলদ-অক্ষর রুচি, গীতলেখা নীলাম্বর-পাতে,
ছয় ঋতু সম্বৎসরে, মহিমা কীর্তন করে, সুখপূর্ণ চরাচর সাথে।
কুসুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শান্তি, বজ্ররবে রুদ্র তুমি ভীম,
তব ভাব গূঢ় অতি, কি জানিবে মূঢ়মতি, ধ্যায় যুগযুগান্তে অসীম।

আনন্দে সবে আনন্দে, তোমার চরণ বন্দে, কোটি সূর্য কোটি চন্দ্রতারা,
তোমারি এ রচনারি, ভাব লয়ে নরনারী, হা হা করে, নেত্রে বহে ধারা।
মিলি সুর নর ঋভু, প্রণমি তোমায় বিভু, তুমি সর্বমঙ্গল-আলয়,
দেও জ্ঞান, দেও প্রেম, দেও ভক্তি, দেও ক্ষেম, দেও দেও ও-পদ-আশ্রয়।

১৩
আসোয়ারী, ঝাঁপতাল

জাগো সকল অমৃতের অধিকারী,
নয়ন খুলিয়ে দেখ করুণানিধান, পাপতাপহারী।
পূরব অরুণ-জ্যোতি মহিমা প্রচারে,
বিহগ যশ গায় তাঁহারি।
হৃদয়-কপাট খুলি, দেখ রে যতনে,
প্রেমময় মুরতি জন-চিত্ত-হারী।
ডাক রে নাথে, বিমল প্রভাতে,
পাইবে শান্তির বারি॥

১৪
ভৈরবী, চৌতাল

জ্ঞানময় জ্যোতিকে যে জানে সেই সত্য জানে।
তাঁরে যেই হৃদে ধ্যায়ে, সেই পায় অচল শরণ।
এক প্রথম তেজ সেই, একেরই অসংখ্য কিরণ,
কতই মঙ্গল জ্ঞান ধরম প্রীতি কান্তি ছায় ভুবন।
গায় তাঁহারে সর্বলোক, মধ্যে সেই বিশ্বলোক, অন্ত কেহ নাহি পায়।
যাচি চরণারবিন্দ, দেহি মে কৃপা-আনন্দ,
আর কার দ্বারে যাব, তুমি সবার দারিদ্র্যভঞ্জন॥

১৫

কাফি, সুরফাঁক্তা

দীন হীন ভকতে, নাথ, করো দয়া,
অনাথনাথ তুমি, হৃদয়রাজ, বিরাজো নিশিদিন হৃদিমাঝে।
তব সহবাস-আশে, আনন্দে হৃদয় ভাসে,
তোমা-বিনা নিশিদিন মন নাথ নাথ ধ্যায়ে॥

১৬

খট, একতালা

ধন্য দেব পূর্ণব্রহ্ম, প্রাণেশ্বর দীনবন্ধু,
দয়াসিন্ধু করুণানিধি, ব্যাকুল-চিতবারি হো!
ভগবজ্জন হৃদ্-রঞ্জন, পাবন জগজীবন,
প্রভু পরমশরণ, পাপী-গতি, আশ্রিত-ভয়হারী হো।
অচ্যুত আনন্দধাম, সত্যাশ্রয় সত্যকাম,
জাগ্রত জীবন্ত দেব, সেবক-কাণ্ডারী,
জ্ঞানানল দীপ্যমান, হৃদাধার হৃদয়েশ্বর,
ভবতারণ হরি কৃপালু, ভকত-মন-বিহারী হো!
অবিনশ্বর পুরাণ পুরুষ, ভগবান ভক্তবৎসল,
কল্যাণ অমব বিশ্বভুবনধারী,
জীবিতেশ হৃদয়রতন, পরমায়ন সত্যপুরুষ,
সদানন্দ জগদ্‌গুরু, জগজন-হিতকারী হো!

১৭

তিলককামোদ, চৌতাল

নয়ন বাহিয়া ঝরে ঝরনা শত,
পেয়ে তব করুণামৃত, তপত এ হৃদিকমলে।
দীনজনের প্রাণবন্ধু, তোমারে পাইলে,
কী ধন না পাই, আনন্দসিন্ধু হৃদে উথলে॥

১৮

কেদারা. চৌতাল

বহিছে কৃপাপবন তোমার, যার হিল্লোলে দুখ পলায়,
সুখসাগরে তরঙ্গ উঠে।
মন্দ মন্দ বরিষে অমৃত, যাতনা অপহৃত, প্রেমকুসুম ফুটে।
সেবিয়ে করুণাবাত, সুখেতে নিশা প্রভাত,
মুক্ত হইয়ে মন-উৎস ছুটে।
কেবলি তারি গুণে জীবন ধরে আছি, নহিলে হৃদয় টুটে ।

১৯

মেঘমল্লার, সুরফাঁক্তা

বিশ্বভুবনরঞ্জন ব্রহ্ম পরমজ্যোতি,
অনাদি দেব জগপতি, প্রাণের প্রাণ!
কতই কৃপা বরষিছ, প্রাণ জুড়ায় সুমধুর প্রেমসমীরে,
দুখতাপ সকলি হয় অবসান।
সবাকার তুমি হে পিতা বন্ধু মাতা,
অনন্ত লোক করে তব প্রেমামৃত পান।
অনাথশরণ এমন আর কে বা তোমা-হেন,
ডাকি তোমারে. দেখা দাও প্রভু হে কৃপানিধান॥

২০

জযজয়ন্তী, ত্রিতাল

বিষয়ের তমোজাল করে আছে নিশাকাল,
কেমনে হইব পার সংসারসাগর এ।
তুমি বিনা কর্ণধার দেখি নে কাহারে আর,
অখিলতারণ তুমি, কোথা হে এ সময়ে?
সান্ত্বনার দিক্ আঁধার বিষাদ-ঘনোদয়ে,
সম্পদ তড়িৎ-সমান উন্মীলি নিমীলয়ে।
পাপতিমির নাশিয়ে, জ্ঞানালোক প্রকাশিয়ে,
দেখা দাও ওহে নাথ, মোর অন্ধ হৃদয়ে॥

২১

নারায়ণী, যৎ

ভজ রে ভজ রে ভবখণ্ডনে, ভজ রে বিশ্বজনবন্দনে,
জগতরঞ্জন ভকতচিত্তবিনোদনে, মোদনে পালনে তারণে,
প্রণতজন-সৌভাগ্যজননে।
শুদ্ধসত্ত্ব জ্যোতির্ময় জ্ঞানে, মুক্তিদাতা জগত-প্রাণে,
অন্তরযামী নিত্য পুরাণে, শাশ্বত বিভু কৃপানিধানে,
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনে, সমস্তপাতকনাশনে,
সর্বলোকাশ্রয়প্রভবে, সত্যাত্মনে, প্রেমাত্মনে॥

২২

ইমনকল্যাণ, চৌতাল

সকল মঙ্গলনিদান, ভবমোচন, অরূপ, চেতনরূপে বিরাজো।
তুমি অকৃত, অমৃতপুরুষ, বিশ্বভুবনপতি, সুন্দর অতি অপূর্ব।
জীবজীবন, দীনশরণ, দুঃখসিন্ধুতারণ হে।
কৃপা বিতর কৃপাসাগর, তার ভব-অন্ধকারে।
অনুপম, শাশ্বত আনন্দ, তুমি জগজীবন,
আকুল-অন্তরে তোমারে চাহে।
পরমব্রহ্ম পরমধাম, পরমেশ্বর সত্যকাম,
পরমশরণ, চরমশান্তি, তুমি সার॥

২৩

ভৈরব, সুরফাঁক্তা

সব দুঃখ দূর হইল তোমারে দেখি—
এ কী অপার করুণা তব! প্রাণ হইল শীতল বিমল সুধায়।
সব দেখি শূন্যময়, না যদি তোমারে পাই,
চন্দ্র সূর্য তারক জ্যোতি হারায়।
প্রাণসখা, তোমা সম আর কেহ নাহি,
প্রেম-সিন্ধু উথলয় স্মরিলে তোমায়।
থাকো সঙ্গে অহরহ, জীবন করো সনাথ,
রাখো প্রভু জীবনে মরণে পদছায়॥

জীবনীপঞ্জি

জন্ম : দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন কলকাতা-জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদা দেবীর দ্বিতীয় সন্তান এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র। বাংলার জমিদার বংশের পারিবারিক প্রথায় জ্যেষ্ঠ পুত্রসন্তানের উত্তরাধিকার চিহ্নিত করার লক্ষ্যে তাঁর নাম রাখা হয়েছিল পিতা ও পিতামহের নামের প্রথম অক্ষর 'দ' দিয়ে। ঠাকুরদের গৃহদেবতা ছিলেন লক্ষ্মীজনার্দন শিলা। এই বংশের নামকরণেও বৈষ্ণব-পরম্পরা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর জন্ম তারিখ ষোলো মার্চ, আঠারোশো চল্লিশ। তিনি ছিলেন একুশ বছরের কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ, বড়োদাদা।

শিক্ষা : উনিশ শতকে শ্রীমন্ত অভিজাত বংশে গৃহপাঠশালা ও গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা থাকত। দ্বিজেন্দ্রনাথ যথারীতি গৃহেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করছিলেন। তখনও শিশু ও বালকদের পাঠোপযোগী পুস্তকাদি বিশেষ ছিল না। বাংলায় 'নীতিকথা' পড়িয়ে পন্ডিতমশাই তাঁকে সংস্কৃত পড়ালেন। 'মুগ্ধবোধ', 'কুমারসম্ভব', 'রঘুবংশ', 'মেঘদূত' পড়বার পর তিনি সেন্ট পলস্ স্কুলে সেকেন্ড ক্লাসে ভর্তি হয়ে দু-বছর পরে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে হিন্দু কলেজ বা বর্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। দ্বিজেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন যে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া তাঁর ভালো লাগত না। রসহীন ইতিহাস অধ্যয়ন, নিয়মমাফিক গণিত তাঁর ভালো লাগত না। ত্রিকোণমিতি ও মেনসুরেশন তাঁর ভালো লাগত এবং বাড়িতে এই দুই বিদ্যার চর্চা তিনি করতেন। মেটকাফ্ হল প্রতিষ্ঠায় দ্বারকানাথ অর্থ দান করেছিলেন, এ কারণে, তাঁর বংশধরেরা ওই হলের গ্রন্থাগার থেকে পড়বার জন্য ইচ্ছেমতো বই নিতে পারতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের যা ভালো লাগত, তা তিনি বাড়িতে বসেই পড়তেন, ফলে ক্লাস কামাই হত। প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার প্রতি বীতরাগে, তাঁর স্মৃতিচারণ অনুসারে তিনি সিপাহি বিদ্রোহের দু-বছর আগে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ায় ইস্তফা দেন। এই হিসেবে, তিনি এগারো বছর বয়সে 'কুমারসম্ভব', 'রঘুবংশ' ইত্যাদি শেষ করে সেন্ট পলস্ স্কুলে ভর্তি

হন; তেরো বছর বয়সে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও পনেরো বছর বয়সে হিন্দু কলেজের লেখাপড়ায় ইস্তফা দেন। প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র মিত্র তাঁর সহপাঠী ছিলেন। এঁদেরও জন্ম আঠারোশো চল্লিশে। অতঃপর দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিচিত্র বিদ্যায় অসাধারণ পারঙ্গম হয়ে ওঠেন। বিষয়ানুরাগ অপেক্ষা জ্ঞানচর্চাই তাঁর জীবনের ব্রত হয়ে ওঠে। কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, গণিত, ত্রিকোণমিতি, সংগীত, চিত্রকলা -ইত্যাদি জ্ঞানচর্চার নানা ক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ ছিল অবাধ।

বিবাহ : আঠারোশো আটান্নতে যশোহর-নরেন্দ্রপুরের তারাচাঁদ চক্রবর্তীর কন্যা সর্বসুন্দরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এই বিবাহে বরকর্তা ছিলেন তাঁর দুই পিতৃব্য রমানাথ ঠাকুর ও নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর। লক্ষণীয়, দেবেন্দ্রনাথ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহে অনুপস্থিত ছিলেন। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহেও দেবেন্দ্রনাথ অনুপস্থিত ছিলেন। বিবাহের সময় সর্বসুন্দরী ছিলেন এগারো বছরের বালিকা। বিবাহিত জীবনের কুড়ি বছরের মধ্যে নয় পুত্র-কন্যার জন্ম দিয়ে প্রসবজনিত অসুস্থতায় সর্বসুন্দরী আঠারোশো আটাত্তরে একত্রিশ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের বয়স তখন আটত্রিশ বছর।

কর্মজীবন : আক্ষরিক অর্থে দ্বিজেন্দ্রনাথের কর্মজীবন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত—যদিও আজীবন তিনি স্বেচ্ছপ্রণোদিত কর্মে ব্যস্ত থেকেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-প্রমুখ এক -এক পুত্রের উপর জমিদারি দেখার ভার দিয়ে পিতা দেবেন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট না হয়ে শেষ-পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের উপরে সেই ভার দেন। পিতার মৃত্যুর পরেও রবীন্দ্রনাথ সেই দায়িত্ব পালন করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ অতি স্বল্পকাল জমিদারি দেখেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর উনিশশো পাঁচেই তিনি কলকাতার সমস্ত সুখভোগ আরাম-সুবিধা-ইত্যাদি বিসর্জন দিয়ে শান্তিনিকেতনবাসী হলেন। শান্তিনিকেতনবাসী হলেও আশ্রমের কাজকর্মের সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ ছিল না। আশ্রম-সীমানার বাইরে নিচু বাংলা এলাকায় তিনি ভৃত্য মুনীশ্বর গৌড়কে নিয়ে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতেন। সাংসারিক ব্যাপারে তিনি যেমন উদাসীন ছিলেন তেমনি বিষয়-আশয় সম্পর্কে তাঁর কোনও বোধ যে ছিল, সেটা তাঁর আচার-আচরণে বোঝা যেত।

সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা : দ্বিজেন্দ্রনাথ চিত্রকর হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সময়ে চিত্রকলা শিক্ষার সুব্যবস্থা না থাকায় তাঁর সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়নি; কিন্তু পত্রে-চিরকুটে তিনি চিত্রাক্ষর ব্যবহার করতেন। 'রেখাক্ষর বর্ণমালা'-শীর্ষক তাঁর বাংলা শর্টহ্যান্ডের বইটি আদ্যন্ত লিথোতে ছাপা। চিত্রকরের বোধ থেকেই তিনি সাংকেতিক রেখাক্ষর যে উদ্ভাবন করেছিলেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

রামনারায়ণ তর্করত্নের সংস্কৃত শিক্ষার পরিণামে দ্বিজেন্দ্রনাথ সংস্কৃত ছন্দে বাংলায় কবিতা লিখতে শুরু করেন। তাঁর সমসাময়িক কবি বলদেব পালিত-ও বাংলায় সংস্কৃত ছন্দে প্রবর্তন করেছিলেন। কুড়ি বছর বয়সেই তিনি কালিদাসের 'মেঘদূত' পদ্যে অনুবাদ করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তখন ইংরেজিতে কবিতা লিখতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুবাদ পড়ে তিনি মন্তব্য করেন যে, তাঁর ধারণা ছিল বাংলায় ভালো কবিতা রচিত হতে পারে না—কিন্তু 'মেঘদূতে'র অনুবাদ তাঁর সেই ধারণা দূর করেছে। উনিশ শতকের মধ্যাহ্নে এমন সাবলীল বাংলায় কাব্যরচনা ছিল দুর্লভ। তরুণ বয়সে তিনি ওস্তাদের কাছে সংগীতশিক্ষা করেছিলেন। বাংলায় তিনিই প্রথম স্বরলিপি-পদ্ধতি রচনা করেন। আঠারোশো উনসত্তরে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় সংগীত লিপিবদ্ধ করিবার চিহ্নাবলী শীর্ষক তাঁর প্রবন্ধ পাঁচটি ব্রহ্মসংগীতের স্বরলিপিসহ ছাপা হয়। এছাড়া 'বালক' পত্রিকাতেও তিনি স্বরলিপি-পদ্ধতি বিষয়ে লিখেছিলেন। তিনি বাঁশিও শিখেছিলেন; তিনি বাঁশি শিখেছিলেন গণিতচর্চার সূত্রে।

সংগীতের সঙ্গে গণিতের গূঢ় যোগের কারণেই বিশ্বের বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা যে সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের চর্চা করে থাকেন, সে কথা স্বীকৃত। দ্বিজেন্দ্রনাথও সংগীতের সুর-তাল-লয়কে গণিতের অন্তর্নিহিত ঐক্য বোঝার ব্যাপারে ব্যবহার করেছিলেন। বস্তুত, তাঁর যাবতীয় চর্চার উদ্দেশ্য ছিল তত্ত্বচর্চা। 'মেঘদূত'-এর সাবলীল অনুবাদের পর তিনি নিরবচ্ছিন্ন কাব্যচর্চা করেননি, যদিও তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনার অবকাশে তিনি মধ্যে-মধ্যে চূর্ণ কবিতা লিখতেন। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে আঠারোশো পঁচাত্তরে আবার তিনি কাব্যজগতে ফিরে এসে 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' নামে দীর্ঘ রূপককাব্য রচনা করেন। এই রূপককাব্যও তত্ত্ববাদী। এরপর আবার তিনি তাঁর তত্ত্বজগতে ফিরে যান। আঠারোশো আটানব্বইতে ব্রাহ্মধর্ম তিনি পদ্যে ব্যাখ্যা করেন। এই কাব্যও তত্ত্ববাদী। উনিশশো বারোতে

প্রকাশিত 'রেখাক্ষর-বর্ণমালা'য় পদ্য আবার তত্ত্ববহনের কাজ করেছে। উনিশশো কুড়িতে 'কাব্য-মালা'য় 'পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম'-সহ তাঁর কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়। বক্সোমেট্রি বা বাকসো তৈরির যে পদ্ধতি তিনি ত্রিকোণমিতির সূত্রে আবিষ্কার করেন, তাকে আধুনিক প্যাকেজিং চর্চার সূচনা বলা যেতে পারে। গোটা বিশ্বে যখন প্যাকেজিং সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না, তখন তিনি এ বিষয়ে মৌলিক ভাবনা ভেবেছিলেন। প্যাকেজিং টেকনোলজির পথিকৃৎ হিসেবে যে গৌরব তাঁর প্রাপ্য ছিল তা তিনি পাননি।

পিতার নির্দেশে তিনি আঠারোশো চৌষট্টি থেকে একাত্তর অবধি আদি ব্রাহ্মসমাজের সচিব-পদাসীন ছিলেন। আঠারোশো একাশিতে তিনি এই সমাজের অন্যতম ট্রাস্টি, আঠারোশো নব্বই থেকে আচার্য, আঠারোশো নিরানব্বই থেকে সভাপতি এবং উনিশশো চার থেকে আচার্য ও সভাপতি পদে কাজ করলেও উনিশশো পাঁচে পিতৃবিয়োগের পর তিনি সমাজ-সংসার ত্যাগ করে শান্তিনিকেতনের একান্তে নিভৃত জীবন-যাপন করেন।

আঠারোশো সাতাশিতে অনুজ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অগ্রজ-দ্বিজেন্দ্রনাথকে সম্পাদক করে 'ভারতী' মাসিক-পত্রিকা প্রকাশ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'আমাকে সম্পাদক হইতে বলিল। আমিও আপত্তি করিলাম না। আমি কিন্তু ওই নামটুকু দিয়াই খালাস। কাজের সমস্ত ভার জ্যোতির উপর পড়িল।' সাত বছর পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পত্নীবিয়োগের পর সংসারে বিরাগী হয়ে 'ভারতী'র প্রকাশ বন্ধ করে দেবার ঘোষণা করেন। তাঁদের ভাগ্নি স্বর্ণকুমারী এই কথা জেনে 'ভারতী'র দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সম্পাদক হন।

আঠারোশো চুরাশি থেকে পরবর্তী পঁচিশ বছর দ্বিজেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন।

আঠারোশো একাশিতে 'হিতবাদী' পত্রিকার পরিকল্পনা দ্বিজেন্দ্রনাথ করেছিলেন এবং 'হিতবাদী' নামটিও দিয়েছিলেন।

আঠারোশো চুয়াত্তরে পরিকল্পিত ঠাকুরবাড়ির 'বিদ্বজ্জন সমাগম'-এর অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। 'হিন্দুমেলা', 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা', 'বেঙ্গল থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি', 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ', 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন' -ইত্যাদি নানা উদ্যমের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ ছিল। তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি-পদে বৃত হয়েছিলেন।

গ্রন্থাবলি :

১. মেঘদূত ('সংস্কৃত হইতে পদ্যে অনুবাদিত'), ১৮৬০

২. ভ্রাতৃভাব (প্রবন্ধ), ১৮৬৩ (ব্রাহ্মদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব প্রসারের লক্ষ্যে ভ্রাতৃসভায় পঠিত প্রবন্ধ সংকলন।)

৩. তত্ত্ববিদ্যা (দর্শন),

ক. প্রথম খন্ড : জ্ঞানকান্ড, ১৮৬৬

খ. দ্বিতীয় খন্ড : ভোগকান্ড, ১৮৬৭

গ. তৃতীয় খন্ড : কর্মকান্ড, ১৮৬৮

ঘ. চতুর্থ খন্ড : সাধন প্রকরণ, ১৮৬৩

(দ্বিজেন্দ্রনাথ স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন, 'আমাদের দেশে আমি যেভাবে দার্শনিক আলোচনা করিয়াছিলাম, সে-রকম আমার পূর্বে আর কেহ করেন নাই। ...সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে পর নবগঠিত সমাজের জন্য একটা philosophy আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল।' দ্বিজেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজিরা তাঁর 'তত্ত্ববিদ্যা' অবলম্বন করেই নতুন সমাজের দর্শন স্থির করলেও কোথাও ঋণ স্বীকার করেননি।)

৪. স্বপ্ন-প্রয়াণ (রূপক কাব্য), ১৮৭৫

(দ্বিজেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন যে, 'স্বপ্ন-প্রয়াণ'-এর প্রথম খসড়া তিনি 'বঙ্গদর্শনে' ছাপার জন্য পাঠিয়েছিলেন। বঙ্কিম তার থেকে এক-আধটা ছেপেছিলেন কিনা, তা তাঁব মনে নেই। কিন্তু বঙ্কিম তাঁর 'বিষবৃক্ষ'-এর মধ্যে ঠিক তেমনই বিভিন্ন লোকজগৎ দর্শিয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন যে, যা স্বপ্নে অশোভন হয় না, হিন্দু গৃহস্থ-চিত্রে তা অত্যন্ত অশোভন হয়ে দাঁড়ায়। 'নগেন্দ্রনাথের ঘরের মধ্যে সেইরকম ছবি থাকতে পারে, কিন্তু বাড়ির মধ্যে গৃহস্থ-বধূ গাড়ি হাঁকাইলেন, এ চিত্র একেবারেই সুশোভন হইল না। কিন্তু এইরকম চিত্র-সমাবেশের ideaটা যে তিনি আমার রচনা হইতে পাইতেছিলেন সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু অন্যত্র গুরুশিষ্য খাড়া করিয়া যে-ভাবে দার্শনিক আলোচনা করিতে বসিলেন, তাহার বহু পূর্বে ঠিক ওইভাবে ওইরকম আলোচনা আমি করিয়াছিলাম।' বস্তুতপক্ষে তাঁরা দুজনেই এই গুরুশিষ্য প্রশ্নোত্তর রীতিটি পেয়েছিলেন গ্রিক ডায়ালগ্ থেকে। (এক্ষেত্রে কেউ উত্তমর্ণ-অধমর্ণ ছিলেন না।)

৫. সোনার কাটি রুপার কাটি, ১৮৮৫ (আটান্ন পৃষ্ঠার এই বইটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দুর্লভ)

৬. সোনায় সোহাগা, ১৮৮৫ (কুড়ি পৃষ্ঠার এই বই বইটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দুর্লভ)

৭. আর্যামি এবং সাহেবিআনা (আলোচনা), ১৮৯০

৮. সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা (আলোচনা), ১৮৯১

৯. সাধনা-প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (আলোচনা), ১৮৯২

১০. অদ্বৈত মতের সমালোচনা (দর্শন), ১৮৯৬

১১. অদ্বৈত মতের প্রথম ও দ্বিতীয় সমালোচনা (দর্শন), ১৮৯৭

১২. পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম (কাব্যে/ধর্মতত্ত্ব), ১৮৯৮

১৩ আর্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত (আলোচনা), ১৮৯৯

১৪. ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাধন (ধর্ম), ১৯০০

১৫. আচার্যের উপদেশ (ধর্ম),

ক. প্রথম খন্ড, ১৯০০

খ. দ্বিতীয় খন্ড, ১৯০২

১৬. শ্রীমন্মহর্ষি দেবের জন্মোৎসব-উপলক্ষে আচার্য শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা (ভাষণ), ১৯০১

১৭. বিদ্যা এবং জ্ঞান (আলোচনা), ১৯০৬

১৮. একটি প্রশ্ন ও তাহার উত্তর (আলোচনা), ১৯০৬

১৯. বঙ্গের রঙ্গভূমি (প্রবন্ধ-সংকলন), ১৯০৭

২০. হারামণির অন্বেষণ (আলোচনা), ১৯০৮

২১ দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব (আলোচনা), ১৯০৮

২২ রেখাক্ষর বর্ণমালা (বাংলা শর্টহ্যান্ড), ১৯১২ (পদ্যাকারে লিখিত, দ্বিজেন্দ্রনাথ-কর্তৃক উদ্ভাবিত বাংলা শর্টহ্যান্ডের প্রথম বই।)

২৩. গীতা-পাঠ (ধর্ম), ১৯১৫

২৪. নানা-চিন্তা (প্রবন্ধ, ভাষণ, পূর্ব-প্রকাশিত পুস্তিকার সংকলন), ১৯২০

২৫. প্রবন্ধ-মালা (প্রবন্ধ, পূর্ব-প্রকাশিত পুস্তিকার সংকলন), ১৯২০

২৬. কাব্য-মালা (কাব্য-সংকলন, 'মেঘদূত' এবং 'পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম'-সহ।), ১৯২০

২৭. চিন্তামণি (প্রবন্ধ, পূর্ব-প্রকাশিত পুস্তিকার সংকলন), ১৯২২

এছাড়া বিপিনবিহারী গুপ্ত-র 'পুরাতন প্রসঙ্গে'র দ্বিতীয় অধ্যায়ে উনিসশো তেইশে দ্বিজেন্দ্রনাথ-কর্তৃক বিবৃত তাঁর স্মৃতিচারণ মুদ্রিত হয়েছে।

২৮. Geometry in which the 12 Axiom has been resplaced by new ones, [?]

২৯. Ontology, 1871

৩০. Boxometry, 1913

এছাড়া তাঁর বহু প্রবন্ধ, তত্ত্বালোচনা, কবিতা, ভাষণ, চূর্ণ-কবিতা, পত্রকাব্য অগ্রন্থিত রয়ে গিয়েছে।

শেষজীবন ও মৃত্যু : বৈষয়িক ব্যাপারে উদাসীন দ্বিজেন্দ্রনাথকে তাঁর পিতা জমিদারি পরিদর্শন-সহ যাবতীয় দায়িত্বশীলতার কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। অপুত্রক ও নিঃসন্তান কেউ ঠাকুরপরিবারের স্থাবর সম্পত্তির অধিকার পেতেন না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিঃসন্তান ছিলেন। বীরেন্দ্রনাথের জীবিতকালেই তাঁর একমাত্র পুত্র বলেন্দ্রনাথ মারা যান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও বীরেন্দ্রনাথের বিধবা স্ত্রী এবং তাঁর বিধবা পুত্রবধূ জমিদারির অংশ পাননি। দেবেন্দ্রনাথ তার শেষ ইচ্ছাপত্র সই করেন আঠারোশো নিরানব্বইতে। তিনি এই ইচ্ছাপত্রের নির্বাহক করেন দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথকে, সত্যেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র সুরেন্দ্রনাথকে ও রবীন্দ্রনাথকে। দেবেন্দ্রনাথের সপুত্রক পুত্রসন্তান হেমেন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারীরা পেয়েছিলেন ওড়িশার জমিদারি। কালিগ্রাম-পতিসর ও বিরাহিমপুর-শিলাইদহের জমিদারি তিন শরিক অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এজমালি থেকে যায়। উনিশশো পাঁচে পিতার মৃত্যুর পর দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ও পৌত্র দিনেন্দ্রনাথকে নিয়ে শান্তিনিকেতন-আশ্রমবাসী হন। কলকাতার সমস্ত সুখভোগ ত্যাগ করে তাঁরা শান্তিনিকেতনের সে সময়ের কষ্টকর জীবনকেই বরণ করে নিয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও তাঁর পুত্র-পৌত্রেরা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন জমিদারির আয়ের উপর। জ্যেষ্ঠ পৌত্র দ্বিপেন্দ্রনাথকে পিতামহ দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সাধনাশ্রম শান্তিনিকেতনের অন্যতম অছি করে এই আশ্রম দেখার দায়িত্ব দিয়ে যান। দ্বিজেন্দ্রনাথের বড়ো ছেলে দ্বিপেন্দ্রনাথ এই দায়িত্ব নিষ্ঠা-সহকারে আমৃত্যু পালন করেন। উনিশশো তেইশে প্রমথ চৌধুরির পরামর্শে ভূবাসনপত্র সই করে রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ এজমালি জমিদারি নিজেদের নামে করে নেন। রবীন্দ্রনাথ হন কালিগ্রাম-পতিসরের জমিদার ও সুরেন্দ্রনাথ হন বিরাহিমপুর শিলাইদহের জমিদার। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য অংশ ওই দুই জমিদারির মধ্যে অর্পিত হইল। রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ এর দরুণ বছরে সাড়ে বাইশ হাজার টাকা দ্বিজেন্দ্রনাথ ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের দেবেন, এই

কভাবে দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে নিষ্পত্তি করলেন। পিতামহের জমিদারির স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী বংশের জ্যেষ্ঠ সন্তান দ্বিজেন্দ্রনাথ এইভাবে হলেন ছোটোভাই রবীন্দ্রনাথের ও ভাইপো সুরেন্দ্রনাথের দেওয়া মাসোহারার উপর নির্ভরশীল।

রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ কথা রাখেননি। বরখেলাপের ফলে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও তাঁর বংশধরেরা অশেষ কষ্টভোগ করেন। এমনকি পরে দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র দিনেন্দ্রনাথ নিজ ভিটেতে রবীন্দ্রনাথের ভাড়াটে হিসেবে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিষয়-আশয়ে উদাসীন দ্বিজেন্দ্রনাথ কোনদিনই কোনো কষ্টভোগে উচ্চবাচ্য করেননি। উনিশশো ছাব্বিশের উনিশে জানুয়ারি ছিয়াশি বছর বয়সে তিনি শান্তিনিকেতনে পরলোকগমন করেন। তাঁকে দাহ করা হয় তাঁর শান্তিনিকেতনস্থিত নিচু বাংলার আবাসের সামনে। তাঁর বাড়ি পরে 'দ্বিজবিরাম' নামে আখ্যাত হয়। তাঁর দাহস্থানে পুত্রবধূ হেমলতা দেবী একটি সমাধি-বেদি স্থাপন করেছিলেন। সেই সমাধিবেদি ভগ্নদশায় অবহেলায় এখনও আছে।